শুকতারা

৫৪

ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪০৮
১০.০০

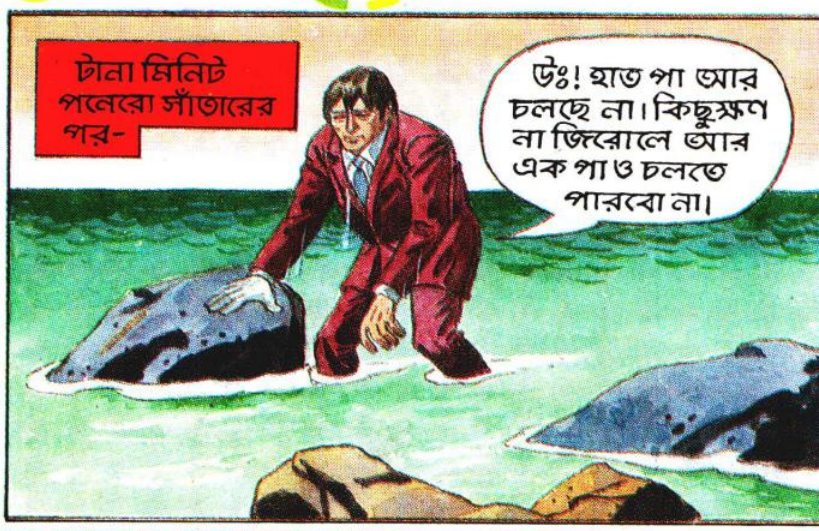

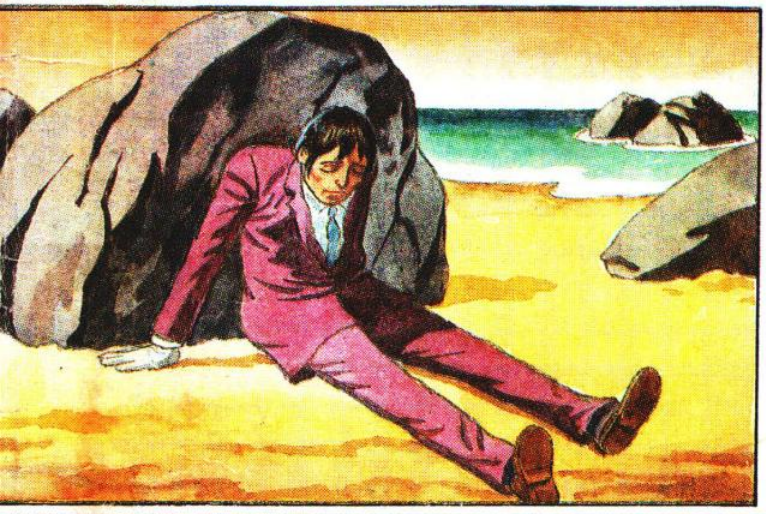

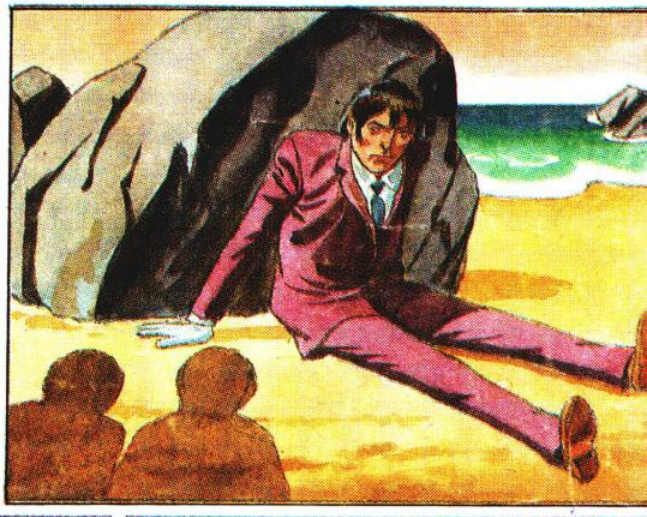

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী
স্ক্যান করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম
এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

কমিক ওয়ার্ল্ড

সদস্যতা

হাঙ্গামা

প্রিয় বন্ধুরা,

শুধুমাত্র একটার জন্য মাত্র কিছু টাকা খরচ করুন আর আপনার পছন্দসই বেশ কিছু চরিত্রের কমিকস পড়ুন! মাত্র একবার কিছু টাকা খরচ করে প্রতি মাসে বেশ কিছু কমিকস পড়ার মজা ওঠান! আপনি শুধু 'কমিক ওয়ার্ল্ড'-এর সদস্যতা নিন আর তার সঙ্গে পান প্রচুর ডায়মণ্ড কমিকস ফ্রী! প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে 25 টাকার উপহার ফ্রী... এক্কেবারে ফ্রী!

হাঙ্গামা উপহার

কমিক ওয়ার্ল্ড সদস্যতা	আপনি দেবেন সদস্যতা শুল্ক	প্রতি মাসে পান 30/- টাকার পত্রিকা	আপনি পাবেন		
			প্রতি মাসে নিন 25/- টাকার ফ্রী উপহার	সদস্যতা শুল্ক দেবার সময় প্রথম সংখ্যার সঙ্গে উপহারস্বরূপ নিন 75/- টাকার ডায়মণ্ড কমিকস	মোট
1 বছরের জন্য	টাকা 360/-	টাকা 360/-	+ টাকা 300/-	+ টাকা 75/-	= টাকা 735/-
2 বছরের জন্য	টাকা 720/-	টাকা 720/-	+ টাকা 600/-	+ টাকা 180/-	= টাকা 1500/-
3 বছরের জন্য	টাকা 1080/-	টাকা 1080/-	+ টাকা 900/-	+ টাকা 250/-	= টাকা 2230/-
5 বছরের জন্য	টাকা 1800/-	টাকা 1800/-	+ টাকা 1500/-	+ টাকা 500/-	= টাকা 3800/-

কমিক ওয়ার্ল্ড সদস্যতা হাঙ্গামা স্কীম
257, দরিবা কলান, দিল্লী-110 006

আমি কমিক ওয়ার্ল্ডের (হিন্দী / ইংরাজী / বাংলা)-র .....বছরের জন্য গৌরবশালী সদস্য হতে চাই! আমি কমিক ওয়ার্ল্ড-এর নামে দেয় .....টাকার মানি অর্ডার / ডি. ডি. নং ..... দিন .....পাঠাচ্ছি! দয়া করে আমাকে টাকার ডায়মণ্ড কমিকস উপহার স্বরূপ ফ্রী পাঠান!

নাম.....বয়স.....

ঠিকানা.....

পিন কোড

* চেক গ্রহণযোগ্য নয়

বাঁটুল দি গ্রেট

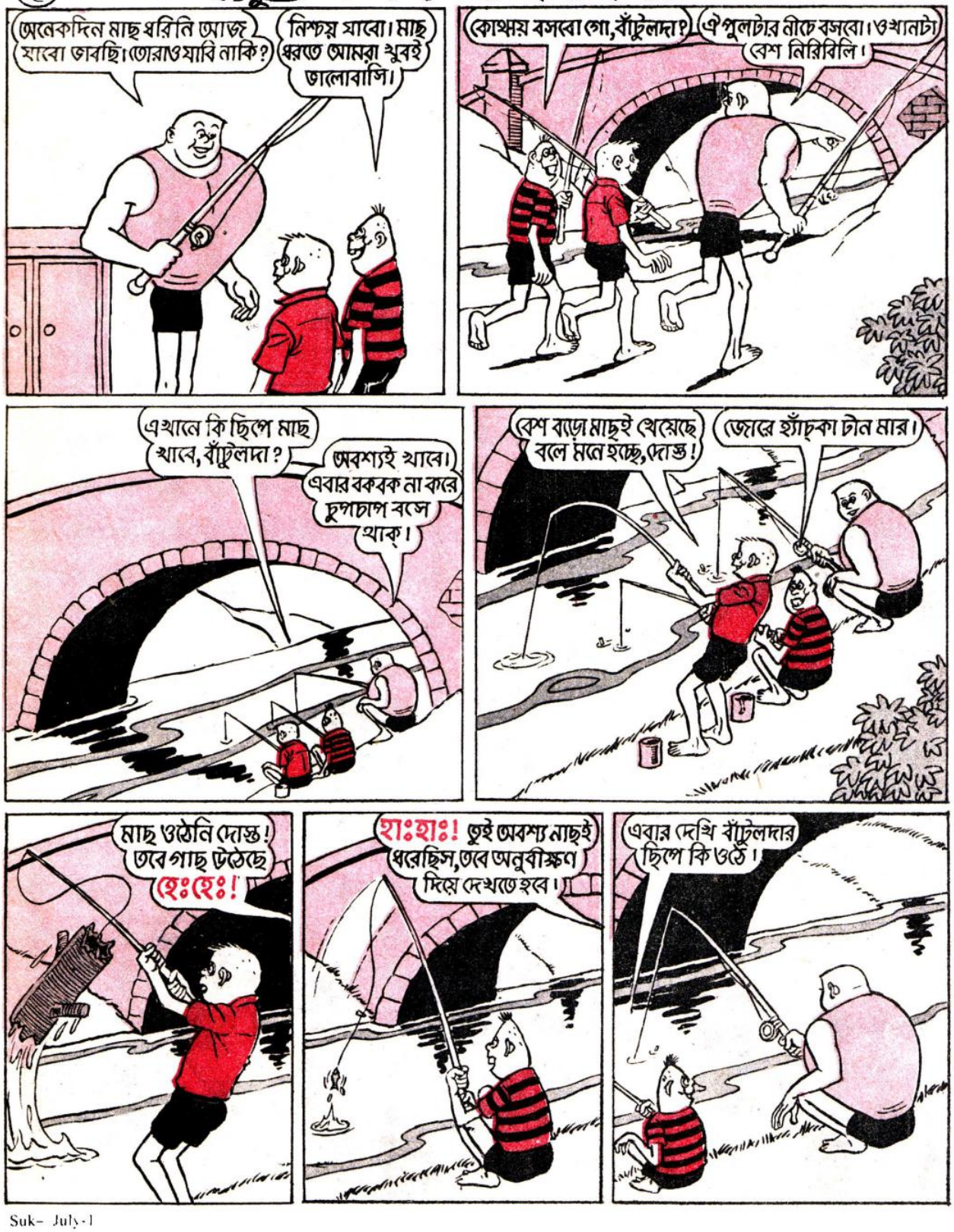
অনেকদিন মাছ ধরিনি আজ যাবো ভাবছি। তোরাও যাবি নাকি?
নিশ্চয় যাবো। মাছ ধরতে আমরা খুবই ভালোবাসি।
কোথায় বসবো গো, বাঁটুলদা?
ঐ পুলটার নীচে বসবো। ওখানটা বেশ নিরিবিলি।
এখানে কি ছিপে মাছ খাবে, বাঁটুলদা?
অবশ্যই খাবে। এবার বকবক না করে চুপচাপ বসে থাক্।
বেশ বড়ো মাছই খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে, দোস্ত!
জোরে হ্যাঁচ্কা টান মার।
মাছ ওঠেনি দোস্ত! তবে গাছ উঠেছে হেঃহেঃ!
হাঃহাঃ! তুই অবশ্য মাছই ধরেছিস, তবে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হবে।
এবার দেখি বাঁটুলদার ছিপে কি ওঠে।

হেঃ! শেষে বাঁটুলদার বাতিল টায়ার!
ধরো ধরো, পাকড়াও! একটা প্রতিষ্ঠানের মাইনে দেবার সুটকেস ভর্তি টাকা ছিনতাই করে পালাচ্ছে!
হিঃ হিঃ! নালার পুলটা পার হলেই ধরে কোন ব্যাটা!
ইরক্!
তাজ্জব! এই তো মাটিতে দৌড়োচ্ছিলুম হঠাৎ শূন্যপথে যাচ্ছি কি করে?
জল থেকে বঁড়শি আটকে টায়ার উঠলো। এবার ডাঙা থেকে টায়ারে আটকে কি ধরেছি!
ওকে ছেড়ো না ওকে আটকে রাখো!
বোধহয় একটা বজ্জাত পাজি ছিনতাইবাজকে ধরেছো, বাঁটুলদা!
সুটকেসটা আমার হাতে দিয়ে অকারণ ভারী হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাও!
এই নিন আপনার টাকার সুটকেস!
তুমি বাঁচালে, বাঁটুল!
আমাদের প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে, বাঁটুল!
আগে এই দোপেয়ে মাছটাকে বিশেষ অ্যাকোয়ারিয়ামে রেখে আসি। চলরে, বাচ্চুরা!

শুকতারা

সূচীপত্র

শ্রাবণ ১৪০৮
জুলাই ২০০১
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে : বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ৩২৫ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA - By Air Mail Rs. 645.00.

R.N.I Registration No. 2621/57

মূল্য : দশ টাকা

বিশেষ আকর্ষণ

৩৫

ইতিহাসে প্রথম এদের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সালে। একসময় ভারতবর্ষে এরা ছিল ক্ষমতার প্রতীক। এদের পোষ মানিয়ে কত কাজ করে নেওয়া হতো। অথচ হাজার হাজার বছর ধরে এরাই হয়েছে মানুষের লোভের শিকার। বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা জেন্টল জায়েন্টস্-এ আছে আফ্রিকার হাতিদের সম্বন্ধে নানা কথা।

২৬

চৌকিদারী করতে করতে মানুষটি এক আশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলল, অথচ তার নাম জানলো না কেউ। সেই অবাক করা মানুষটিকে পাবে এবার ফিরে দেখায়-য়। লেখক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩২

সেরা চিঠি লিখলেই পুরস্কার। ভাবনা-চিন্তা করে চিঠি লেখ চিঠিপত্র-র পাতায় আর চটপট জিতে নাও ১০০ টাকা পুরস্কার।

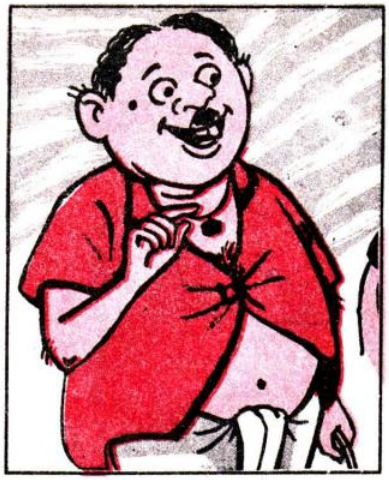

১৩

চুপিচুপি গুপ্ত অ্যান্ড কোং-এর কাছে ছুটে এসেছেন মুচমুচলাল পাঁপড়ওয়ালা। এক হনুমানের জ্বালায় তাঁর পাঁপড় ব্যবসা নষ্ট হতে বসেছে। চুপিচুপি গুপ্তকে একটা বিহিত করতেই হবে। শুরু হলো দীপঙ্কর বিশ্বাসের নতুন ধারাবাহিক অপারেশন হনুমান।

একগুচ্ছ গল্প

৬

বর্ষার রাতে জলার মধ্যে আলোর ঝলকানি। সেই আলোর উৎস একটা সাপ। তবে কি রূপকথার গল্পই সত্যি হলো? সঙ্কর্ষণ রায়ের বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প সাপের মাথার মণি।

৫৮

পরীক্ষার পর কোয়েলা চেয়েছিল একটা কেস। পুরীতে বেড়াতে এসে আচম্বিতেই মিলে গেল সেটা। সুরজিৎ ঘোষের রহস্য গল্প ক্লেপ্টো-ম্যানিয়াক।

মধুরেণ সমাপয়েৎ
—অমিতাভশঙ্কর রায়চৌধুরী ৬৯
খুশির হাসি—বাণী রায় ৩৩
গেছো ও মেছো (ভূতের)
—অশোক লাখদার ৬৬
মধু-কৈটভ বধ (পুরাণ)
—শান্তিগোপাল পাণ্ডে ৭১

পুরস্কৃত গল্প

৪৯

আদর্শের উত্তরাধিকারী (প্রথম)
—সৌরভ কুমার ভূঞ্যা
স্বীকারোক্তি (দ্বিতীয়)
—অঞ্জনা রায় ৫০

নাটক

১২

নাট্যে কথামৃত—জ্যোতিভূষণ চাকী

ফিচার

কেরিয়ার গাইড
—ডি. এ. চন্দ্রণ ৫৬
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৫৩
গল্প হলেও সত্যি
— তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
সেদিনের সাক্ষী ব্যান্ডেল ব্যাসিলিকা
—শুভব্রত ভট্টাচার্য ৩০
বিশ্বের প্রথম মহাকাশ পর্যটক
—সুরভি বসু ১৮
জানা-অজানা—মহসীন মল্লিক ১৭
আজব খবর—বরুণ মজুমদার ৬৪

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শা.প্রি.ব. ৪১
উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৭
শরীর গড়তে যোগ ও
ব্যায়াম—তুষার শীল ৪৮

কবিতা ও ছড়া

মা বললে
—সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৫
টস—শুভ সরকার ৬৫
টক্কা টরে টক্কা
—অরুণ ঘোষাল ৬৫
ভাল্লাগে না
—অতীন বসু ৬৫
আসছে পুজোয়
—রণজিৎ ভট্টাচার্য ৬৫

বিভাগীয় লেখা

আমরা বলছি ২৪
মনের জানলা
—জগদিন্দ্র মণ্ডল ২৭
দাদুমণির চিঠি ২১
তোমাদের পাতা ২২
মজার পাতা ৬২

কমিকস

১

বাঁটুল দি গ্রেট
—নারায়ণ দেবনাথ
হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ২৮
ব্ল্যাক ক্যাট ৫৪

প্রচ্ছদ ঃ খুনে বিজ্ঞানীর দ্বীপে.
—নারায়ণ দেবনাথ

ঘোষণা

সুব্রত মজুমদার স্মৃতি-সাহিত্য
প্রতিযোগিতা ৫২
জানো কী! ১৯

৫৪ বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● শ্রাবণ ১৪০৮ ● জুলাই ২০০১

মা বললে

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

মা বললে রাত কেটে যায়
সোনার সকাল আসে,
মা বললে পাতার কোলে
ফুলকুঁড়িরা হাসে।

মা বললে রুক্ষ মনে
বৃষ্টি-ফোঁটা ঝরে,
মা বললে কান্না থামে
খুশিতে মন ভরে।

মা বললে চাঁদের আলোয়
জীবন ভরে যায়,
মাগো, তোমার স্নেহের দেনা
শোধা বড়ই দায়!

ছবিঃ সুফি

সাপের মাথার মণি

সঙ্কর্ষণ রায়

মধ্যপ্রদেশের পূর্ব সীমান্তে যশপুরনগর একটি ছোট পাহাড়ি শহর। তার চারদিকে ঘন বন। অনেকখানি এলাকা জুড়ে আছে এই বন। ইংরেজদের আমলে হাতি ও সিংহ ছাড়া সবরকম বন্যপ্রাণী ছিল এখানে। সে সময় যশপুরনগর ও চারপাশের বনের এলাকা নিয়ে ছিল 'যশপুর' নামে ছোট্ট একটি করদ রাজ্য। তখন বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ নিয়ে এদেশে কোনো চিন্তাভাবনা শুরু হয়নি, ইংরেজ সরকার বন্যপ্রাণীদের শিকার করার ওপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। কিন্তু যশপুরের পশুপ্রেমিক মহারাজা তাঁর রাজ্যের বনের মধ্যে শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, স্বয়ং গভর্নরের সুপারিশপত্র নিয়ে আসা ইংরেজ শিকারীদেরও তিনি যশপুরের বনের ভেতরে ঢুকতে দিতেন না। কাজেই এই বন ছিল বনের পশুদের স্বর্গরাজ্য—অভয়ারণ্য।

বন্যপ্রাণীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উপভোগ করতেন মহারাজা বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। বনের ভেতরে একটি ছোট হ্রদ ছিল, সেই হ্রদের ধারে বনের পশুরা জল খাওয়ার জন্য একত্র হতো। সেখানে একটি গাছের ওপরে ঘর তৈরি করিয়েছিলেন মহারাজা, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'জঙ্গলমহল'। প্রায়ই তিনি থাকতেন এই জঙ্গলমহলে জংলি জানোয়ারদের সাহচর্য পাবার জন্য।

পশুপ্রেমিক মহারাজা কখনো শিকার করেননি, রাইফেল বা বন্দুক চালাতেও জানতেন না। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় বনের মধ্যে তাঁর ঘোরাঘুরি কি বিপজ্জনক ছিল না? কেউ কি থাকতেন না তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য?

এই সব প্রশ্ন করেছিলাম আমি যশপুরনগরের পূর্ণেন্দু দাশগুপ্তকে। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী হিমানীর (আমার পিসতুতো দাদার মেয়ে) আমন্ত্রণে আমি এবং আমার জ্যাঠতুতো দাদা ফণীন্দ্রনাথ যশপুরনগরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য বনের মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়ার আগে যশপুরের মহারাজের বনে ঘুরে বেড়ানোর গল্প করছিলেন পূর্ণেন্দু। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, বশির খাঁ আর আমি সঙ্গ দিতাম তাঁকে। বশির খাঁ বনরক্ষী ও জঙ্গলমহলের কেয়ারটেকার। আমি এখনো তাঁকে সঙ্গ দিয়ে চলেছি। তিনি নিরস্ত্র হলেও আমি সশস্ত্রে যাই। শিকারের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যই আমার অস্ত্রবহন।

শিকার কি কখনো করেননি আপনি?

মহারাজার সঙ্গে বন্ধুত্বের আগে করেছি। এখানে অবশ্য নয়, মাণ্ডলা, বালাঘাট ও বস্তারের বনে। পেশাদার

শিকারী ছিলাম, বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের শিকারের শখ মেটাবার জন্য তাঁদের নিয়ে বনে বনে ঘুরে শিকার করেছি। শিকারের সঙ্গে মাংস-বিশেষজ্ঞ হিসেবেও কাজ করেছি।

অনেকরকম বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে জানলেও মাংস-বিশেষজ্ঞের কথা এই প্রথম শুনলাম। হতবুদ্ধির মতো নির্বাক বিস্ময়ে আমি পূর্ণেন্দুর মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে শিকারী জীবনে সবরকম পশুপাখি এবং সরীসৃপের মাংসের স্বাদ নেবার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। মানুষের মাংস অবশ্য খাননি, খাবার সুযোগ হয়নি বলেই খাননি। তাঁর ধারণা এদেশে তাঁর মতো মাংসাশী মানুষ দ্বিতীয় কেউই নেই। বিভিন্ন পশুপাখির মাংসের গুণানুক্রমিক ভালমন্দ সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার তাঁরই আছে। একটি আন্তর্জাতিক পাঁচতারা হোটেল গোষ্ঠী তাঁকে তাঁদের মাংস-বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে সব মাংসের সেরা সোনা ব্যাঙের মাংস, সবচেয়ে অখাদ্য বনবেড়ালের মাংস।

সাপের মাংস? আমার প্রশ্ন।

মন্দ নয়। মৃদু হেসে জবাব দিলেন পূর্ণেন্দু, খেতে অনেকটা মাছের মতো। চট্টগ্রামের কাছে রাঙামাটিতে বছর দশেক আগে আমার এক চাকমা বন্ধু তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাত আর অজগর সাপের মাংস খাইয়েছিল, খেতে খেতে মনে হয়েছিল যেন শোল মাছ খাচ্ছি...

চুপ কর তো! ধমক দিয়ে উঠল হিমানী, কি সব অখাদ্য-কুখাদ্য একসময় খেয়েছিলে, তার গল্প কাকাদের কাছে করতে হবে না! শুনতে বমি আসছে আমার। সেজকাকা, ওকে থামাও তো।

তোমাদের বনের গল্প কর পূর্ণেন্দু। মেজদা (ফণীন্দ্র) বললেন, তোমাদের বনের মধ্যে অহিংস শিকারের কথা বল।

অহিংস শিকারই বটে! পূর্ণেন্দু বললেন, কাঁধে রাইফেল ও বন্দুক, কোমরে রিভলভার, মহারাজার জঙ্গল-মহলে বসে সামনের হ্রদে পাশাপাশি বাঘ, সম্বর ও দাঁতালো শুয়োরকে জল খেতে দেখে আমার শিকারীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠেছে, হাত নিশপিশ করেছে, নিজেকে সংযত করেছি অনেক কষ্টে। আমার চাপা উত্তেজনা ও অস্থিরতা মহারাজার দৃষ্টি এড়ায়নি, মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তিনি বলেছেন, শিকার করতে না পারলেও মনে মনে তো শিকার করেই চলেছ। মহারাজার কথার ওপরে কোনো কথা বলতে অবশ্য পারিনি, কারণ সত্যি কথাই বলেছিলেন তিনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সক্রিয়ভাবে শিকার না করে মনে মনে শিকার করাকে অহিংস শিকার বলা যায় কি না।... এই প্রশ্নের জবাবে যশপুরের মহারাজা বলেছিলেন, না। সক্রিয়ভাবে শিকার না করে মনে মনে শিকার করলেও তাকে সহিংস শিকারই বলা উচিত। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকলে মনের মধ্যে হিংসা চেপে রেখে শিকার না করা

নিজেকে সংযত করেছি অনেক কষ্টে।

সাপটির মৃতদেহ দেখতে পান।

খুবই কঠিন ব্যাপার।

মেজদা প্রশ্ন করেন, ভাল কথা, আত্মরক্ষার জন্যও কি কখনো বন্দুক বা রাইফেলের ট্রিগারে হাত দাওনি?

পূর্ণেন্দু জবাব দেন, দিয়েছি একবার, মানে দিতে বাধ্য হয়েছি। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা...

পূর্ণেন্দুর অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি।

আমরা যশপুরনগরে যাবার মাস কয়েক আগে ভরা বর্ষার মধ্যে একদিন চিতার আনাগোনার খবর পেয়ে মহারাজা ও পূর্ণেন্দু বনের মধ্যে ঢোকেন। ঢুকলেও বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারেননি, কারণ বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বেড়েই চলছিল। তাঁরা বাধ্য হন জঙ্গলমহলের মধ্যে আশ্রয় নিতে। জঙ্গলমহলের সামনে বসে হ্রদের ধারে বন্যপ্রাণীদের জল খাওয়ার জায়গাটির দিকে নজর রাখেন। হ্রদের ধারে একটি ছোট পাহাড় বা টিলা। টিলার নিচে পাথর ও মাটির মধ্যে জায়গায় জায়গায় নুন, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের সমাহরণ ঘটেছে। বন্যপ্রাণীরা এখানে নুন চাটতে আসে। সাধারণত হ্রদে জল খাওয়ার আগে তারা এখানে নুন চাটে। বন্য পশুদের এ জাতীয় নুন চাটার জায়গাকে ইংরেজিতে বলে 'সল্ট লিক' (Salt lick)।

আর সকলের সঙ্গে চিতাও যে এখানে আসবে সেটা অনুমান করে তাঁরা জঙ্গলমহলের বারান্দায় বসে প্রতীক্ষা করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সুন্দরবন ছাড়া ভারতের সব বনে চিতাবাঘ থাকলেও চিতা দুর্লভ প্রাণী। চিতাবাঘ ও বাঘ বেড়াল শ্রেণীর প্রাণী। চিতার চামড়া চিতাবাঘের মতো হলেও 'চিতা' কুকুর জাতীয় জন্তু। স্বভাবে চিতা বাঘ ও চিতাবাঘের চেয়ে কম হিংস্র এবং সহজেই মানুষের পোষ মানে। মধ্যভারত ও রাজস্থানের কয়েকটি করদ রাজ্যের রাজারা চিতা পুষতেন। যশপুরের মহারাজারও চিতা ধরে পোষার শখ ছিল, কিন্তু ওখানকার বনে চিতা ছিল না বলে এ শখ মেটাতে পারেননি এ পর্যন্ত। বনের মধ্যে হঠাৎ তার শুভাগমনের খবর

পেয়ে তিনি উল্লসিত, পূর্ণেন্দুকে বলেন যে করে হোক চিতাটাকে ধরতে হবে। পূর্ণেন্দু বলেন, ধরা পরের কথা, আগে সত্যিই সে এসেছে কিনা জানা দরকার।

বৃষ্টির মধ্যে তার সন্ধানে বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি সম্ভব নয়, কাজেই জঙ্গল-মহলের বারান্দায় বসে হ্রদের ধারে বন্যপ্রাণীদের জল খাওয়ার জায়গা এবং টিলার নিচে সল্ট লিকের দিকে নজর রাখেন তাঁরা। বিকেলের দিকে প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও আসে বন্যপ্রাণীদের অনেকেই — বাঘ, নীলগাই, চিতাবাঘ ও বুনো শুয়োর পাশাপাশি জল খেয়ে চলে যায়। আসে এই বনে বিরল গাওর, বুনো কুকুর, এক পাল চিতল হরিণ, বারো শিংগা, সম্বর, খরগোশ, বড় আকারের বনবিড়াল, নেকড়ে ও হায়েনা। কিন্তু যার আসার আশায় মহারাজা ও পূর্ণেন্দু বসে আছেন, সে আসে না। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সারা দিন কাটে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহারাজা বললেন, ভুল খবর এনেছে বশির খাঁ, হয়তো চিতাবাঘকে চিতা বলে ভুল করেছে।

বশির খাঁ বললে, না হুজুর, ভুল আমি করিনি, সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম...

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর বৃষ্টির বেগ কমে আসে। কিন্তু বেগ কমে গেলেও সন্ধ্যা হতেই বন্যপ্রাণীদের এখানে আসা বন্ধ হয়ে যায়। বন্যপ্রাণীরা প্রায় সকলেই নিশাচর, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার হতেই এখানে আসা বন্ধ করে দেয় কেন তারা? সন্ধ্যার পর কি তারা নুন চাটে না বা জল খায় না?

তা তো নয়। মহারাজার প্রশ্নের জবাবে পূর্ণেন্দু বললেন, মাণ্ডলা, বালাঘাট ও বস্তারের বনে সল্ট লিক বা ওয়াটার হোলে সন্ধ্যার পরই বুনো জানোয়ারদের ভিড় দেখতাম।

তা হলে সন্ধ্যা হতেই এখানে ওদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক। আসে না কেন ভেবে দেখেছেন কি?

উত্তরে পূর্ণেন্দু কিছু বলার আগেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখা গেল টিলার নিচে সল্ট লিকের কাছাকাছি একটি জলার মধ্যে। হ্রদের কাছে এই অগভীর জলাটি ঘাস, আগাছা ও শ্যাওলায় ভর্তি। উদ্ভিজ্জের ঘন সমাবেশ জলকে চাপা দিয়েছে, দিনের আলোয় বনের মাঝখানে একটি ঘন সবুজ কার্পেটের মতো দেখাচ্ছিল এটাকে। দিনের আলো নিভে আসার পর অন্ধকার ঘনীভূত হতেই তার বুক ফুঁড়ে আলো বেরিয়ে আসে। স্তম্ভের আকারের আলো বা আলোক-স্তম্ভ।

নির্বাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ আলোক-স্তম্ভটির দিকে তাকিয়ে থেকে মহারাজা রুদ্ধশ্বাসে বললেন, দেখেছেন পূর্ণেন্দুবাবু, দেখেছেন?

দেখেছি বই কি। পূর্ণেন্দু জবাব দিলেন, দেখেছি এবং দেখছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'...

আলো দেখছেন, আলোর উৎসটিকে দেখতে পাচ্ছেন না?

আলোর উৎস তো ওই শ্যাওলায় ভরা জলা...

না, আলোর উৎস একটা সাপ— রাজগোখরো শঙ্খচূড়, এই দেখুন...

আলোর স্তম্ভটাই যেন হঠাৎ সাপে রূপান্তরিত হয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল। পূর্ণেন্দুর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সাপটি কি স্বয়ংপ্রভ? এত বছর ধরে বনে বনে ঘোরাঘুরি করেছেন পূর্ণেন্দু, অনেকরকম পশুপাখি ও সরীসৃপের দেখা পেয়েছেন, কিন্তু স্বয়ংপ্রভ সাপ কখনো দেখেননি।

চুপ করে আছেন কেন পূর্ণেন্দুবাবু? চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে মহারাজা বললেন, কিছু একটা বলুন।

কি আর বলব বলুন! পূর্ণেন্দু কম্পিত স্বরে বললেন, এই প্রথম দেখছি সাপের গা থেকে আলো বেরোচ্ছে।

সাপের মাথার মণি। এই আলোর উৎস ঐ রাজগোখরোর মাথার মণি...

রূপকথার গল্পে শুনেছি সাপের মাথার মণির কথা। আসলে তা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য...

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, তবু বলছেন অবাস্তব অবিশ্বাস্য!

চোখের সামনে কোনো মণিমাণিক্য তো দেখতে পাচ্ছি না।

সাপ তার মাথার মণি কি সর্বদা মাথায় করে রাখে! মাঝে মাঝে মাটিতে নামায়, হয়তো এখনই রেখেছে নামিয়ে। জলার শ্যাওলার স্তর ফুঁড়ে আলো বেরিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে, যেন শ্যাওলার স্তরের তলায় রেখেছে কোথাও।

যতক্ষণ দিনের আলো ছিল ততক্ষণ প্রকাশ পায়নি এই আলো, সাপটা কি অন্ধকার হতে এসেছে?

আমার ধারণা সাপটা এখানেই থাকে, এখানেই তার আস্তানা, মণির আলো দিনের আলোয় চাপা ছিল, অন্ধকার হতেই প্রকাশ পেয়েছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির বেগ আবার বাড়ে। ফণা তুলে দাঁড়ানো সাপটি বৃষ্টির বেগ বেড়ে যেতেই ক্ষেপে ওঠে, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে তার ফোঁসফোঁসানি ওঁদের কানে আসে। জঙ্গলমহলের কাছে ছিল মহারাজার জিপ, বৃষ্টির জলে ধোয়া জিপটির গায়ে জলার শ্যাওলা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা আলো প্রতিফলিত হয়ে যে উজ্জ্বল দীপ্তি সৃষ্টি করে তা সাপটিকে উত্তেজিত করে তোলে, সে তেড়ে যায় জিপের দিকে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তেড়ে আসা সাপটির দিকে তাকিয়ে ছিল বশির খাঁ, সে বললে, হুজুর ঠিকই বলেছেন, এইটেই মণিওয়ালা সাপ, ঐ ডোবার শ্যাওলার তলায় মণিটাকে রেখে পাহারা দিচ্ছে। জিপটাকে দেখে ও ভাবছে বুঝি কেউ ওর মণিটাকে চুরি করতে এসেছে, তাই ক্ষেপে গিয়ে জিপের দিকে তেড়ে এসেছে।

মৃদু হেসে পূর্ণেন্দু বললেন, সাপ যে ভাবতে পারে তোমার মুখে এই প্রথম শুনলাম।

যে সাপ মণি মাথায় করে রাখে, অনেক রকম ক্ষমতা আছে তার, সে ভাবতে পারবে না তো কে পারবে!

সাপটাকে মাথায় মণি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছ কি কখনো বশির খাঁ?

আমি না দেখলেও আমার দোস্ত পবন মুণ্ডা দেখেছিল। কিন্তু সাপটার কাছে গিয়ে মণিটা ভাল করে দেখতে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে মরেছে সে।

নিজের চোখে যা দেখনি তাকে

বিশ্বাস কর কি করে বশির খাঁ?

উত্তরে বশির খাঁ কিছু বলার আগে মহারাজা বললেন, নিজের চোখে আমিও দেখিনি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই সাপের মাথায় মণি আছে। অন্ধকার হতেই মণি থেকে আলো ফুটে বের হয়, সেই আলো দেখে বনের জীবজন্তুরা ভয় পায়, তাই অন্ধকার হলে তারা এদিকে আসে না। পূর্ণেন্দুবাবু, আপনাদের বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে না বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর

ইতিমধ্যে সাপটি জিপের গায়ে ছোবলের পর ছোবল মেরে যেতে থাকে।

সাপের আক্রোশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রকৃতির রোষও যেন বেড়ে যেতে থাকে। বেড়ে যায় বৃষ্টির বেগ এবং হঠাৎ ধস নামে টিলার মাথা থেকে। টিলার মাটি ও পাথর বৃষ্টির জলে আলগা হয়ে জলপ্রপাতের মতো নেমে আসে। পূর্ণেন্দু তাকে 'কর্দমপ্রপাত' বলে বর্ণনা করেন। পাথরমেশানো এই কাদার স্তূপ চাপা দেয় শ্যাওলাধরা জলা ও জিপটিকে। সাপটিকে আর দেখা যায় না, বোধ হয় সে-ও চাপা পড়ে যায় কাদার তলায়। একই সঙ্গে নিভে যায় শ্যাওলার স্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা মহারাজা বর্ণিত সাপের মাথার মণির আলো।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য সারারাত মহারাজা এবং পূর্ণেন্দু জঙ্গলমহলে বন্দী হয়ে রইলেন। বশির খাঁ জঙ্গলমহলে কিছু চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ মজুত করে রেখেছিল, তা দিয়ে খিচুড়ি ও আলুভাজা রান্না করে খাওয়ায় তাঁদের দুজনকে। খাওয়ার পর শোওয়ার ব্যবস্থাও করে কিন্তু অতিবর্ষণ তাঁদের দুজনকে জাগিয়ে রাখে।

এই দুর্যোগ বনের পশুদের কতখানি ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে মহারাজা প্রশ্ন করেন পূর্ণেন্দুকে। পূর্ণেন্দু জবাব দিতে পারেন না, কারণ এমন প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। তবে মহারাজাকে জানান তাঁর মনে হয় আত্মরক্ষার যে সহজাত প্রবৃত্তি বনের পশুদের আছে তা দিয়ে তারা এই দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে।

তবে ধসে চাপা পড়া শঙ্খচূড়টি

অবশ্য আত্মরক্ষা করতে পারেনি। পূর্ণেন্দু বলেন মহারাজাকে, স্পষ্ট দেখলাম আপনার জিপের মতো সেও ধসের তলায় চাপা পড়েছে।

চাপা পড়লেও মারা পড়েছে বলে মনে হয় না, মহারাজা বললেন। খুবই শক্তিশালী সাপ এই রাজগোখরো, প্রচণ্ড ওর প্রাণশক্তি। ও যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ বৃষ্টি থামলেই পাওয়া যাবে।

বৃষ্টি না থামলেও পরদিন সকালে সাপটি যে ধসে চাপা পড়ে মারা পড়েনি তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দিনের আলো ফুটে উঠতেই দেখা গেল যে জিপটি ধসে পড়া মাটি ও পাথরের তলায় চাপা পড়ে আছে, তাকে উদ্ধার করতে হলে বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। এখান থেকে যশপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিলেন পূর্ণেন্দু। বশির খাঁকে তিনি যশপুরে গিয়ে মহারাজার হাতিশাল থেকে হাতি নিয়ে আসতে বললেন।

এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে যাবে কি করে বশির খাঁ! মহারাজা বললেন, বৃষ্টি থামলে পর আমরা না হয় হেঁটেই যাব।

মহারাজা হেঁটে যাবেন তা কি কখনো হয়! বশির খাঁ বললে, বৃষ্টি এখন কিছুটা কমে এসেছে, ছাতা মাথায় দিয়ে অনায়াসে চলে যাব, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব হাতি নিয়ে।

বলেই জঙ্গলমহল থেকে মাটিতে নেমে আসে বশির খাঁ। কিন্তু সে মাটিতে নামতেই শঙ্খচূড় সাপটি তেড়ে আসে। কাছেই ধসের মাটি ও পাথরের স্তূপের ভেতরে লুকিয়ে ছিল, বশিরকে দেখতেই ফণা তুলে ছুটে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে মই বেয়ে জঙ্গলমহলে ফিরে আসে বশির। বশির তার নাগালের বাইরে উঠে এলেও প্রচণ্ড আক্রোশে সাপটা মইয়ের গায়ে ছোবলের পর ছোবল মারতে থাকে।

কি প্রচণ্ড আক্রোশ দেখেছেন তো পূর্ণেন্দুবাবু! মহারাজা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মণি হারিয়ে ক্ষেপে গিয়েছে। মণিহারা ফণী আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বার চেয়েও হিংস্র। মণিটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওর হিংস্রতা কমবে না।

আমাদের ওপরে ক্ষেপে গিয়েছে কেন? পূর্ণেন্দু বললেন, ওর মণি তো আমরা চুরি করিনি।

ক্ষেপে গিয়েছে বিশ্বসংসারের ওপরে। এখানে আমরা ছাড়া আর তো কেউই নেই, কাজেই আমাদের ওপরেই আপাতত ওর আক্রোশ পুঞ্জীভূত।

পূর্ণেন্দু বললেন, যা সে হারিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার জন্য দায়ী। মণিওয়ালা সাপ তো আপনার মতে বিচারবুদ্ধিযুক্ত জীব, তাই না রাজাসাহেব?

অবশ্যই। মহারাজা জবাব দিলেন।

তা হলে এই মণিহারা ফণীর বোঝা উচিত যে আমরা নির্দোষ, দোষী প্রকৃতি, রাগ করা উচিত তার প্রকৃতির ওপরে।

হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সে আমাদের দায়ী করছে। এমনও হতে পারে যে মণিহারা সাপ তার মণির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি হারিয়েছে।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে বেলা দুটোর সময় তার বেগ কিছুটা কমে। পূর্ণেন্দু বশির খাঁকে আর একবার জঙ্গলমহল থেকে নেমে যশপুরে যাওয়ার চেষ্টা করতে বলেন। বাতাসে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে

বশির খাঁ বললে, সাপটা বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও নেই, তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি না, কাজেই নিরাপদে যেতে পারার আশা রাখি।

ধসের মাটি ও পাথরের স্তূপের তলায় লুকিয়ে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পাওয়া সম্ভব নয়, মহারাজা বললেন, কাজেই সাবধান।

কোনো ভয় নেই। পূর্ণেন্দু বললেন, আমি আছি।

তুমি আছ তো কি হয়েছে!

মহারাজার কথার ওপরে কোনো মন্তব্য না করে একটু কেবল হাসলেন পূর্ণেন্দু।

গাছ থেকে নেমে যায় বশির খাঁ। ছাতা মাথায় দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে সে এমন সময় ধসের মাটি-পাথরের স্তূপ থেকে বেরিয়ে আসে একটি নয়, দুটি শঙ্খচূড় সাপ।

দেখেছেন পূর্ণেন্দুবাবু! কম্পিত স্বরে মহারাজা বললেন, মণিহারা ফণীর সঙ্গী বা সঙ্গিনী। বশির খাঁ, ফিরে এস...

ফিরে আসতে পারে না বশির খাঁ, কারণ দুটি সাপই তার সামনে এসে ফণা তুলে দাঁড়ায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাঁড়িয়ে উঠে বশির খাঁয়ের মাথার ওপরে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। প্রচণ্ড ভয়ে বশির খাঁয়ের সর্বাঙ্গ কাঁপে, গলায় স্বর ফোটে না...

এমন সময় রাইফেল তুলে পর পর সাপ দুটির ফণা লক্ষ্য করে গুলি করেন পূর্ণেন্দু।

অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। দুটি সাপই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে মিশে যায়, মাটি যেন তাদের গ্রাস করে নেয়। বশির খাঁ বললে, যেখানে পড়েছে সেখানেই একটি গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ে উধাও হয়ে গিয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার! পূর্ণেন্দু বললেন, আমার রাইফেলের গুলি দুটি সাপেরই ফণা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তারপর তারা তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকল কি করে!

অলৌকিক শক্তিধর এই শঙ্খচূড় সাপ! মহারাজা বললেন, তাদের মেরে ফেলা খুবই কঠিন, আমার ধারণা তারা মরেও মরে না।

কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম আমার রাইফেলের গুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে তাদের ফণা দুটিকে, তারপরও তারা বেঁচে থাকে কি করে?

কি করে বেঁচে থাকে জানি না, কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাস তারা বেঁচে আছে এবং আবার জঙ্গলমহলে উঠে আসবে প্রতিশোধ নেবার জন্য। খুবই অন্যায় করেছেন গুলি করে।

আমি গুলি না করলে ওদের ছোবল খেয়ে বশির খাঁ মরত। বশির খাঁকে বাঁচাবার জন্য ওদের মারলাম।

মারতে কি আর পেরেছেন? মরেও মরেনি ওরা! চলুন পালাই। জানি না, পালিয়েও পারব কিনা আত্মরক্ষা করতে! আমাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে হয়তো আমার হাবেলিতে পৌঁছে যাবে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যশপুরের রাজপ্রাসাদের নিজস্ব মহলে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন মহারাজা। পূর্ণেন্দু বৃষ্টি থামার পর বশির খাঁ ও তার লোকজন নিয়ে জঙ্গলমহলে যান মহারাজার জিপটিকে উদ্ধার করার জন্য।

জিপটিকে উদ্ধার করার আগে পূর্ণেন্দু শঙ্খচূড় সাপদুটির মৃতদেহ দেখতে পান। বশির খাঁ একজন সাপুড়েকে নিয়ে গিয়েছিল, সে জঙ্গলমহলের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে বলে যে আর একটিও সাপ নেই সেখানে। ভাঙা কিছু ডিমের খোলা (সেই শঙ্খচূড় সাপের) অবশ্য দেখা যায়। অক্ষত একটা ডিমও তার চোখে পড়েনি, বশির খাঁ ও পূর্ণেন্দুকে সে সাপের ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে বলে।

সাপুড়ের অভয়বাণী কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভরসা আনে না মহারাজার মনে। পূর্ণেন্দুকে তিনি বললেন, যে সাপের মাথায় মণি থাকে সে অমর, সে তার হারানো মণি উদ্ধার করতে ফিরে আসবেই।

ধসে চাপা পড়ে গেছে হ্রদের কাছাকাছি শ্যাওলার স্তরের আবরণযুক্ত জলাটি। কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ফলে আর একটি জলা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বৃষ্টির ধারারাহিত গাছের ডালপালা ও পাতা জমেছে সেখানে, উপরন্তু বড় বড় ঘাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাতের আঁধারে জঙ্গলমহল থেকে একদিন রাত্রে এখানে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' দেখতে পেলেন পূর্ণেন্দু। সেদিন দুর্যোগের রাতে যেমন দেখেছিলেন, অবিকল তেমনি আর একটি আলোক-স্তম্ভ জলের বুক ফুঁড়ে দাঁড়ায়। সে রাতের মতো এই আলো অবশ্য সাপের ফণার আকার নেয় না।

পূর্ণেন্দু এগিয়ে যান ঐ আলোর দিকে। বশির খাঁ তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস পায় না বলে একলাই চলেন তিনি। আলোর কাছে গিয়ে দেখলেন জলে ভেজা গাছের পাতা, ডালপালা ও ঘাস থেকে এই আলো বেরিয়ে আসছে। এমনি আলো পুব বাংলার একটি গ্রামে রাতের পর রাত দেখে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছিলেন তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করার ক্ষমতা', যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

কিন্তু পূর্ণেন্দুর এই আবিষ্কার মহারাজার মন থেকে সাপের মাথার মণি সংক্রান্ত ভয় দূর করতে পারে না। তিনি মনে করেন যে ধসের তলায় জলার মধ্যে চাপা পড়ে আছে যার মাথার মণি সে আসবে তাকে খুঁজে বের করার জন্য।

ছবি : জুরান নাথ

নাট্যে কথামৃত

জ্যোতিভূষণ চাকী

স্বার্থ ও আদর্শ

প্রথম দৃশ্য

[রাজপুরুষ এসেছে জয়পুর গোবিন্‌জির পূজারীদের ডাকতে]

রাজপুরুষ—চলো ঠাকুর। রাজামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

পূজারী ১—ডেকে পাঠিয়েছেন?

পূজারী ২—দরকার থাকে তিনি নিজে আসতে পারেন।

পূজারী ৩—বলো গে যাও গোবিন্‌জির পূজারীরা রাজা ডাকলেও যায় না।

রাজপুরুষ—তাহলে রাজাকে গিয়ে তাই বলব?

পূজারীরা (সমস্বরে)—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো গে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজামশাই সিংহাসনে বসে আছেন। রাজপুরুষের প্রবেশ]

রাজপুরুষ—জয় হোক মহারাজের।

রাজা—গোবিন্‌জির পূজারীদের খবর দিয়েছ?

রাজপুরুষ—আজ্ঞে দিয়েছি, মহারাজ। কিন্তু তেনারা আসবেন না। বললেন, দরকার থাকে রাজামশাই নিজে আসুন।

রাজা—এত বড়ো আস্পর্ধা!

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজামশাই কী ভাবতে ভাবতে পায়চারি করছেন।]

রাজা (স্বগত)—না, জোরজবরদস্তি করব না। অন্যভাবে ওদের শায়েস্তা করব। ওদের সব কটার বিয়ে দিয়ে দেব। সংসার যখন হবে তখন এটা-ওটার জন্যে আমার কাছেই ধর্ণা দিতে হবে। আমি এখুনি মন্ত্রীমশাইকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

(প্রকাশ্যে)—কে আছিস? মন্ত্রীমশাইকে খবর দে।

চতুর্থ দৃশ্য

[মন্ত্রীমশাই ও রাজামশাই উপবিষ্ট]

রাজা—শুনলেন তো সব কথা?

মন্ত্রী—ভাবছি ওদের এত দেমাক হলো কী করে? আপনি হুকুম করুন এখুনি বেঁধে আনছি সবকটাকে।

রাজা—না, মন্ত্রীমশাই। জোরজবরদস্তি না করে কৌশলে ওদের বাগে আনতে হবে।

মন্ত্রী—কী কৌশল মহারাজ?

রাজা—ওদের সব কটাকে বিয়ে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রী—সে আর শক্ত কাজ কী মহারাজ। ঘটকেরা তো মুখিয়ে আছে। কিন্তু তাতে লাভ কী মহারাজ? ওদের দেমাক তো তাতে বেড়েই যাবে।

রাজা—মজাটাই দেখুন না।

মন্ত্রী—ঠিক আছে, আমি বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

পঞ্চম দৃশ্য

[বেশ কিছুদিন পরে। রাজা ও মন্ত্রী উপবিষ্ট]

রাজা—দেখছেন তো মন্ত্রীমশাই। সংসার করবার পর ওরা নিজেরাই আমার কাছে আসছে নানান প্রয়োজনে।

মন্ত্রী—তাই তো দেখছি মহারাজ। কোথায় গেছে ওদের দেমাক আর দাপট। এখন তো নতজানু হয়ে আপনার কাছে আসছে। এটা চাই ওটা চাই, মহারাজ, আপনি না দিলে আমরা কোথায় পাব।

[রক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী—মহারাজ। গোবিন্‌জির মন্দিরের মোহান্ত এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মহারাজ—ভিতরে আসতে বলো।

মোহান্ত—মহারাজের জয় হোক। বড়ো বিপদে পড়েছি মহারাজ। ছেলেটার খুব অসুখ। আপনি দয়া না করলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না।

মহারাজ—তোমরা তো এখন সবাই আমার কাছেই ধর্ণা দিচ্ছ নানা প্রয়োজনে। কিন্তু মনে পড়ে একদিন আমি ডেকে পাঠালেও তোমরা বলেছিলে দরকার থাকে রাজামশাই নিজে আসুন, আমরা তাঁর কাছে যাব না।

[লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মোহান্ত]

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক—স্বার্থ যখন আসে তখন সংকল্প আদর্শ মর্যাদাবোধ সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যতক্ষণ স্বার্থ ছিল না মোহান্তদের মাথা উঁচু ছিল। তারপর যখন সংসারের প্রয়োজনে স্বার্থ এল তখন সব আদর্শ ভেসে গেল।

[বিবেকের প্রস্থান]

ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস

অপারেশন হনুমান

দীপঙ্কর বিশ্বাস

চুপিচুপি গুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট ডিটেকটিভস সংস্থার নাম দাবানলের মতন বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা নিজেদের রোজগারের টাকায় গণেশদের বাড়ির একতলায় চুপিচুপি গুপ্তর অফিসটাকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। হাবুর কুকুর নেপচুন দারুণ বাহাদুরি দেখিয়েছিল সংস্থার প্রথম কেস 'আংটি রহস্য'র সমাধানে। তাই নেপচুনকে চুপিচুপি গুপ্ত কোম্পানির স্থায়ী সদস্য করে নেবার কথা আমি আর গণেশ ভাবছিলাম। নেপচুনকে দিয়ে আরো টাকা রোজগারের আশায় হাবু যাতায়াতের পথে খবর করছিল আমরা নতুন কোনও কেস-টেস হাতে নিলাম কিনা। 'সরল গোয়েন্দাগিরি' বইটার পেছনে আমরা ইতিমধ্যেই যা সময় দিয়েছি তা কোনো পরীক্ষায় বা

পাঠ্যবইয়ের পেছনেও দিইনি। বানান ভুলগুলো পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেছে। বইটার কল্যাণে বাংলা বানান আমরা অনেকটাই শিখে ফেলেছি।

শুক্রবার সকালবেলা চুপিচুপি গুপ্তর, মানে আমাদের অফিসে বসে, গণেশ একটা পাখির পালক দিয়ে একমনে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, 'নেপচুনের কথাটা আমি হাবুকে বলেছিলাম, কিন্তু হাবু পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে ওকে আমাদের দলে নিলে তবেই ও নেপচুনকে ভিড়তে দেবে, নয়তো এরকম ভাড়া নিয়েই চালাতে হবে।'

আমি বললাম, 'অসম্ভব। হাবুর মাথায় আর যাই থাক বুদ্ধি নেই, কিন্তু সবতাতে কথা বলা চাই। তোর মনে আছে? সেদিন যখন কেমিস্ট্রির স্যার ফটিকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সোনা মানে স্বর্ণ খোলা হাওয়ায় রেখে দিলে কি হয়? হাবু হাত তুলে ফটিকবাবুর অনুমতি নিয়ে বলল, চুরি হয়ে যায় স্যার। সারা ক্লাশ হাসিতে ফেটে পড়ল আর হাবুকে ফটিকবাবু দাঁড় করিয়ে রাখলেন।'

আমার কথা তখনও শেষ হয়নি দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন এক উস্কোখুস্কো ভদ্রলোক। না কামানো গোঁফ দাড়ির ফাঁকেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের ডান গালে কেউ সজোরে আঁচড়ে দিয়েছে।

ড্রয়ার থেকে লেন্স বার করে টেবিলের ফুটোয় একটা ছারপোকা দেখতে দেখতে আমি বললাম, 'আমরা এখন ব্যস্ত আছি, আপনি একটু পরে আসুন।'

ভদ্রলোক সাংঘাতিক উত্তেজিত। ধপ করে বসে পড়ে পাঁচমিশেলি ভাষায় বললেন, 'দেরি করা সম্ভব লয় মিস্টার চুপিচুপি গুপ্তা...'

গণেশ উঠে দাঁড়িয়ে সরল গোয়েন্দাগিরির নির্দেশ অনুযায়ী বলল, 'আমরা আপাতত পার্সোনাল কেস নিচ্ছি না। দেখুন, আপনার বাড়ির কেউ আপনাকে আঁচড়ে বা কামড়ে দিয়েছেন, সেটা আপনার পার্সোনাল কেস।'

ভদ্রলোক জোর দিয়ে বললেন, 'হানুমান।'

আমি বললাম, 'নিজের বাড়ির লোককে আপনি হনুমান, চামচিকে, ক্ষীরের পুলি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু সেটা বলবার জায়গা আমাদের অফিস নয়। ওসব নিজের বাড়ি গিয়ে বলবেন।'

ভদ্রলোক উত্তেজনায় নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। প্রায় ডুকরে উঠলেন, 'মিস্টার চুপিচুপি গুপ্তা Please, Please আমাকে বলতে দিন। It's a case of a big monk faced blanky.

আমি আর গণেশ পরস্পরের দিকে তাকালাম, monkey জানি, donkey জানি, monk-ও প্রায় জানি কিন্তু blanky?

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'I'm sorry. It's a case of a big black faced monkey.'

গণেশ আর আমি বুঝলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনও বীর হনুমানের মোলাকাত হয়েছিল। গালের আঁচড়টা তারই অভদ্র বীরত্বের স্বাক্ষর। এটা মোটেই ওঁর পার্সোনাল কেস না। গণেশ এবার আমাদের পরিচয় দিল, 'আমি গোয়েন্দা চুপিচুপি আর এ আমার শাগরেদ গুপ্তা।' ভদ্রলোকের নাম জানা গেল মুচমুচেলাল পাঁপড়ওয়ালা। থাকেন পাশের পাড়ায়।

গণেশ বলল, 'আপনার যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। সব ভেবেচিন্তে কেস হাতে নেব কিনা জানাবো।' সরল গোয়েন্দা-গিরির নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ক'দিনেই খুব সিস্টেমেটিক হয়ে গেছি। গণেশ ড্রয়ার থেকে একটা বড় ডায়রি আর পেন বার করল মক্কেলের বক্তব্য নোট করার জন্য, 'আমাদের ফী কিন্তু একটু বেশি মিস্টার পাঁপড়ওয়ালা। সেটা আগেই বলে রাখি।'

মিস্টার পাঁপড়ওয়ালা পাঁচমিশেলি ভাষায় তাঁর কাহিনী বলতে শুরু করলেন। 'আমরা চার জেনারেশন কলকাত্তায় আছি। চৈতন্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যে বড়ো বাড়িটাতে, সেটা হামাদের বাড়ি। কলকাত্তায় আমাদের তিন জেনারেশনের পাঁপড়ের বেওসা। বাড়ির ভিতর পাঁপড় তৈরি হয় তারপর সেগুলো ছাতে রোদ্দুরে শুকিয়ে প্যাকিং করে চালান দেওয়া হয় মহাজনদের কাছে। আমাদের বাড়ির ছাতটা বহুত বড়ো। সাধারণ বাড়ির পাঁচ-সাতটার সমান হোবে। এত্তোদিন লছমীজি কি কিরপাসে আমাদের বেওসার কোনও গড়বড় হয়নি। গত এক মাস হোবে, হররোজ একটা বীর হালুমান, এই ইতনা বড়া হোগা, শ্রীরাম জানে কাঁহাসে আকর ছাতের ওপর সব পাঁপড় নষ্ট করে দিচ্ছে। কুছু খাচ্ছে কুছু ফাড়ছে বাকি সব পাও দিয়ে মাড়িয়ে খারাপ করে দিচ্ছে।'

গণেশ বাধা দিল, 'মিস্টার পাঁপড়ওয়ালা, আপনি হনুমানের যা সাইজ দেখালেন সেটা হাতির সাইজ। একটু যদি ছোট করতেন—'

পাঁপড়ওয়ালা মানুষ ভালো, জেদাজেদিতে না গিয়ে গণেশের এক কথায় হনুমানের সাইজটা অর্ধেক করে দিলেন। গণেশ বলল, 'এখন মোটামুটি ঠিক আছে। তারপর বলে যান।'

'হানুমানটা কাম করে বহুত জলদি। আমরা পরথম বুঝতে পারিনি। সবাই ভাবছিল ভূত-উত হোবে। কিন্তু একদিন আমার মেয়ে মুন্নি হানুমানটাকে দেখে লিল পাঁপড় ফাড়তে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বাড়ির ছাতের পাশে গাছ আছে?'

'বহুত। ওই দিয়েই তো হালুমানটা আসে।'

'গাছ কেটে ফেলা সম্ভব না?'

'লাভ হোবে না। ও বেটা জলের পাইপ বেয়ে চলে আসবে।'

জলের পাইপও খুলে ফেলা যায় কিনা সে প্রশ্ন আমি আরম্ভ করতেই গণেশ আমার পা মাড়িয়ে আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তারপর বলুন।'

'পরথম সবাই বলল বজরংবলী আর রামজীর পুজো দিতে। পুজো দিলাম কিন্তু কোনও কাজ হলো না। আমার ফ্যাক্টরিতে বেশি লেডিজ ওয়ার্কার পাঁপড় বনায়। ছেলে ওয়ার্কার দুয়েকজন। আমি

ওয়ার্কারদের বললাম ডাণ্ডা নিয়ে হানুমান তাড়াতে। কিন্তু—হানুমান বড়া পাকা খেলোয়াড়। তিন-চারজন লাঠি হাতে ওয়ার্কারের সঙ্গে হানুমান যেন চোর চোর খেলে। শেষে হানুমান ভাগে কিন্তু ওয়ার্কার আর হানুমানের পায়ে পায়ে পাঁপড় একদম খারাপ হয়ে যায়। এমনি তিনচার রোজ গেল আমি ওয়ার্কারদের বেকুফ বলে গালি দিয়ে ওদের হানুমান তাড়ানোর খেলা বন্ধ করলাম।' একটু দম নিয়ে একগ্লাস জল খেলেন মিস্টার পাঁপড়ওয়ালা। 'আজ সকালে আমি একটা ডাণ্ডা নিয়ে ছাতের পুবদিকে জলের ট্যাঙ্কির পিছে লুকিয়ে ছিলাম। হানুমানটা পচ্ছিম দিক দিয়ে ছাতে নামল, তারপর পাঁপড় খেতে খেতে আর নষ্ট করতে করতে এদিকে এলো। যব বেশ কাছে এসে গেছে, আমি ট্যাঙ্কির পিছন থেকে জাম্প দিয়ে ডাণ্ডা হাতে সামনে দাঁড়ালাম। হালুমানটা ডরল না—ভড়কাল না—'

'হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ল?' শুধোল গণেশ।

'ঠিক তাই।'

আমার মনটা এতক্ষণে শান্তি পেল। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না পাঁপড়ওয়ালা কেন মাঝে মাঝে হানুমান না বলে হালুমান বলছিলেন। এখন পরিষ্কার। হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়া হনুমানকে হালুমান বলাই উচিত। আমি গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ভয় পেলেন?'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাঁপড়ওয়ালা লজ্জামাখা গলায় বললেন, 'হাঁ বহুৎ। হানুমানটা আমার হাত থেকে ডাণ্ডা ফেলে দিল। দাঁত দেখাল। তারপর আঁচড়ে দিল আর থাপ্পড় দিল। আমি দৌড়ে গিয়ে ছাতের দরজা থেকে দেখলাম হানুমানটা ছাতে ঘুরে ঘুরে অনেক পাঁপড় খেয়ে আর অনেক পাঁপড় নষ্ট করে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি আপনাদের ঠিকানা যোগাড় করে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছি। এ হানুমানটার কি বেপার? কোথা থেকে আসে? কেন আসে? সব জেনে আপনাদের ওটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। বহুৎ নুকসান হচ্ছে। টাকা যা লাগে আমি দেব।'

হানুমান বড়া পাকা খেলোয়াড়।

আমরা বললাম, 'মিস্টার পাঁপড়ওয়ালা, আপনি ঠিকানা লিখে দিয়ে বাড়ি যান। আমরা বিকেলে গিয়ে আপনাকে বলে আসবো এ কেস আমরা নেব কিনা।'

'আপনাদের নিতেই হোবে মিস্টার চুপিচুপি গুপ্তা।' পাঁপড়ওয়ালা বিদায় নিলেন।

দরজা বন্ধ করে আমি গণেশকে বললাম, 'গোয়েন্দা চুপিচুপি, হনুমান ধরাটা কি গোয়েন্দাগিরির আওতায় পড়ে?'

গণেশ একটু ভেবে জবাব দিল, 'সরল গোয়েন্দাগিরিতে কোথাও কিন্তু লেখা নেই গুপ্ত, যে আততায়ীকে মানুষই হতে হবে। আততায়ী is আততায়ী। পুরুষ, মহিলা, হনুমান, অক্টোপাস যা খুশিই হতে পারে। গোয়েন্দাদের কাজ রহস্যোদঘাটন করে তাকে সনাক্ত করা। পাঁপড়ওয়ালা কিন্তু ভাবছে হনুমানটার পেছনে মানুষের চক্রান্ত আছে।'

'আমারও তাই মনে হয় গোয়েন্দা চুপিচুপি। তাই পাঁপড়ওয়ালা চিড়িয়াখানা বা পশুবিশেষজ্ঞদের কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। কেসটা তাহলে আমরা নিচ্ছি? আর ধরেই নিচ্ছি যে পাঁপড়গুলো হনুমান খেলেও এর পেছনে মানুষের হাত আছে!'

'একরকম তাই। ব্যাপারটা অবশ্যই প্রমাণ-সাপেক্ষ কিন্তু আমার ধারণা প্রমাণ খুব সহজেই হবে। এখন এসব শিকেয় তুলে নাওয়া-খাওয়া সারবে চলো গুপ্ত। যে আততায়ীর দল পেটের ভেতর ডন-বৈঠক দিচ্ছে তাদের তো ধরা যাবে না। আমি পৌনে চারটেয় তোমার বাড়ি আসব তারপর চারটের সময় পাঁপড়ওয়ালার বাড়ি।'

মিস্টার মুচমুচেলাল পাঁপড়ওয়ালার বিরাট বাড়ি। আমাদের খুব খাতির করে নিয়ে গেলেন তিনতলার ছাতে। ছাত নয়তো যেন ফুটবলের মাঠ। দু'পাশ দিয়ে দুটো সিঁড়ি। দু'কোণে দুটো বিশাল জলের ট্যাঙ্ক। ছাতের একপাশে রাস্তা আরেকপাশে একটা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি। বাকি দু'দিকে খোলা জমির থেকে উঠে বট, অশ্বত্থ, কদম গাছেরা ঝুঁকে পড়েছে বাড়ির ছাতে। আমি গাছগুলো ভালোভাবে দেখতে দেখতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'হনুমানটা কি এখান দিয়েই আসে?'

পাঁপড়ওয়ালা সম্মতি জানালেন, 'বিলকুল।'

গণেশও নজর করেছে বটগাছ বেয়ে হনুমানটা যেখান দিয়ে ছাতে আসে সেই জায়গাটার ডালপালা মুচড়ে দুমড়ে

নানা স্বাদের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
কিরীটী ৪ ৪০.০০
৪টি রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনী এক সঙ্গে (নিশির ডাক, রক্তমুখী ড্রাগন, রাতের আতঙ্ক ও বিষের তীর)
সাদা কালো ৫৫.০০
আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প ভালো আবার বলো ৪০.০০
শিবরাম চক্রবর্তীর
যত হাসি ততই মজা ৪০.০০
হাসির চোটে দম ফাটে ৫২.০০
হাসির ফোয়ারা ৪৫.০০
হাসির টেক্কা ৫৫.০০
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কেল্লা রহস্য২০.০০ **সুড়ঙ্গ রহস্য** ২০.০০
ভাঙা বাড়ির রহস্য ২০.০০
জঙ্গল রহস্য ১৮.০০
ফর্মুলা রহস্য ২২.০০
যাদুঘর রহস্য ২৫.০০
বাতিঘর রহস্য ২৫.০০
পাতালঘর রহস্য ২০.০০
তীরন্দাজ ১৮.০০ **মুখোশ** ১৬.০০
চিত্তরঞ্জন মাইতির
রুরু ৩৫.০০
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ফাঁসি ২৫.০০ **অপারেশন এক্স** ৩০.০০
সুভাষ ধরের
বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে ৩০.০০
রাধারমণ রায়ের
রণডাকাত ২৬.০০
দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুর্গ পাহাড়ে বন্দী ২০.০০

ভূতের গল্প

গৌরী দের
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২৪.০০
ভূতেরা ভয়ঙ্কর ২৬.০০
গা ছমছমে ভূতের গল্প ২২.০০
মানবেন্দ্র পালের
অশরীরী আতঙ্ক ৩৫.০০ **আতঙ্ক** ৩৫.০০
শিশির কুমার মজুমদারের
অমাবস্যার রাতে ২৫.০০
দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত
রাক্ষস খোক্কস ৪৫.০০
ভূত পেত্নী রক্তচোষা ৪০.০০
ভূত পেত্নী দত্যি দানা ৪৫.০০
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৬.০০
★ বিস্তারিত পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন কলকাতা-৯

অন্যরকম হয়ে গেছে। মিস্টার পাঁপড়ওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা নিজেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাতের আনাচ-কানাচ আর চারধার পরীক্ষা করে দু'চারটে পয়েন্ট নোট করে রাখলাম। নিজেদের ভেতর ভালো করে আলোচনা করার পর মিস্টার পাঁপড়ওয়ালাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম।

'হনুমানটা সকালে কটা নাগাদ আসে?'

'তা আন্দাজ এগারোটা হোবে।'

'হনুমানটা রোজ আসে? নাকি পাঁপড় শুকোতে দিলে তবেই—?'

'ছাতে পাঁপড় না থাকলে তো কেউ নজর রাখে না—' একটু ভাবলেন ভদ্রলোক, 'নাঃ। ছুটির দিনে বাচ্চারা ছাতে খেলে। হানুমান আসে না তো। মানে পাঁপড় না থাকলে হানুমান আসে না।'

'হুঁ। আপনার কি মনে হয় এর পেছনে লোক আছে?'

'জরুর।'

'ওদের লাভ?'

'আমার নুকসান করে বিজনেস তুলে দেবার মতলব।'

'হুঁ। তা আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

'আমার বিজনেসের কোনও কম্পিটিটর হোবে। এয়সা কম্পিটিটর বহুৎ আছে। কে কাছে থাকে জানি না। কাকে সন্দেহ করবো। বহুৎ নুকসান হয়ে গেছে মিস্টার চুপিচুপি গুপ্তা,' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ভদ্রলোকের বুক থেকে।

গণেশ আর আমি আরেকটু আলোচনা করে নিয়ে বললাম, 'কাল সকাল নটা-দশটা থেকে আমরা এখানে থাকবো। ওই ট্যাঙ্কের পাশে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আমরা ট্যাঙ্ক সারাতে এসেছি।'

আমি রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই গণেশকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চুপিচুপি, আমরা কেন ধরেই নিচ্ছি যে হনুমানটা কারুর পাঠানো? এমনো তো হতে পারে যে হনুমানটা একদিন আচমকাই এই ছাতে এসে পাঁপড় খেয়েছিল তারপর থেকে নিত্য আসে।'

গণেশ বলল, 'দেখ গুপ্ত, আগে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা আজকে পাঁপড়ওলার সঙ্গে কথা বলে কেটে গেছে। তুমি কটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। তুমি এতো বড়ো হয়েছ, কলকাতার এই এলাকায় তুমি কটা হনুমান দেখেছ নিজেকে ছাড়া? কলকাতার এই মানুষের ভিড়ে হনুমানটাকে কেউ আশ্রয় না দিলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে? যেদিন পাঁপড় শুকোতে দেয় না সেদিন হনুমানটা আসে না কেন? ওটা কি হাত গুনতে জানে?'

'হুঁ। বোঝা গেল।' বললাম আমি।

গণেশ বলল, 'এখন হনুমানের গতিবিধি সম্বন্ধে প্রচুর জানা দরকার নাহলে কিছুতেই বোঝা যাবে না হনুমানটাকে দিয়ে কি করে এমন উৎপাত করানো হচ্ছে। তোর রচনার বইয়ে হনুমানের রচনা আছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'গণেশ চল অরুণমামার কাছে যাই। সেজমামার বন্ধু। কাছেই থাকেন। একটা কলেজে পড়ান অরুণমামা। সারাদিন পড়াশোনা নিয়েই কাটান। জানেন না এমন সাবজেক্ট নেই। পিঁপড়ে থেকে ডাইনোসর সবকিছু সম্বন্ধেই প্রচুর জ্ঞান। পণ্ডিত লোক কিন্তু পাণ্ডিত্যের ভারে হোঁৎকা মেরে যাননি। হায়ার সেকেন্ডারিতে থার্ড হয়েছিলেন অরুণমামা। দেখবি ঠিক ঠিক বলে দেবেন হনুমানের নাড়ীনক্ষত্রের কথা। কি করে হনুমানকে বশ করা যায় আর অবশ করা যায়।'

প্রায় সন্ধ্যে ছটা বাজে আমরা দৌড়োলাম অরুণমামার বাড়ি।

অরুণমামা পড়ার টেবিলেই বসেছিলেন, আমাদের দেখে বসতে বললেন। আমি গণেশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম অরুণমামার। গণেশ একটু আমতা আমতা করে বলল, 'অরুণমামা আমরা হনুমান-টনুমান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। আপনি খাস কলকাতায় হনুমান দেখেছেন?'

আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে অরুণমামা বললেন, 'তা দেখেছি বৈকি।'

আমরা অপমানিত হওয়া উচিত কিনা ভাবার আগেই অরুণমামা বলে চললেন, 'বাংলা ভাষায় বুঝলে বানর আর বনমানুষের ভেতরেই সব জাতীয় হনুমানকে ধরে রেখেছে। ইংরিজি আরেকটু উদার। মূলত যে নামগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো Ape, Gorilla, Chimpanzee, Monkey, Langur, Orangutan–'

আমি বাধ্য হলাম বাধা দিতে। 'ও বাবাঃ। অতোগুলোর ইতিহাস...'

অরুণমামার মুখ দেখে থেমে গেলাম। বাধার সঙ্গে খুব ব্যথাও পেয়েছেন। পোল্‌ভল্টের দৌড়ের শেষে লাফানোর মুখে লাঠি কেড়ে নিলে যেমন হয়। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। অরুণমামাকে তো চিনি। ওই ল্যাংমারা কি একটার নাম করলেন ওটার ওপরেই ঝাড়া তিন ঘণ্টা বলে যেতে পারেন।

গণেশ একটু মাথা চুলকে খুব নম্র গলায় বলল, 'আমরা এসেছিলাম শুধু মুখপোড়া হনুমানের স্বভাব-টভাব সম্বন্ধে কিছু জানতে।'

অরুণমামার কথায় এবার আমরাই হতাশ হলাম। 'হনুমানের particulars জানতে অনেক পড়াশোনা করতে হবে। তোরা বরং কালকে আয়।'

অরুণমামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ আমরা হাজির হলাম পাঁপড়ওলার বাড়ির ছাতে। যেদিক দিয়ে হনুমানটা আসে তার উল্টো দিকের জলের ট্যাঙ্কের পাশে লুকিয়ে পড়লাম। ছদ্মবেশ পরিনি কারণ হনুমানটা লোক দেখলে কেয়ার করে না। প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য আমরা সঙ্গে দুটো ছোট লোহার রড রেখেছি। গণেশ আপত্তি করছিল কিন্তু আমি পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে হনুমানের আঁচড় খাবার আমার কোনও ইচ্ছে নেই। ট্যাঙ্কের পাশ থেকে আমরা সব লক্ষ্য করছি। ঘটনাপরম্পরা পুরোপুরি দেখতে হবে।

বেলা সওয়া দশটা নাগাদ অনেকগুলো ট্রেতে করে মেয়েরা পাঁপড় শুকোতে দিয়ে গেল। আগেই জানা আছে পাঁপড় নষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি তাই পাঁপড়ওয়ালা কম পাঁপড় শুধু ভেজাল দিয়েই তৈরি করিয়েছে, যাতে লোকসান কম হয়।

আধঘণ্টাও কাটেনি আমরা চারদিকে কড়া নজর রাখছি, হঠাৎ গণেশ আমার মাথাটা ধরে ঘুরিয়ে দিল বটগাছের দিকে। আমি ভালো করে দেখলাম ঘন ডালপালার ভেতর একটা হনুমান বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

আমি গণেশকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হনুমানটা কিসের অপেক্ষা করছে?'

গণেশ বলল, 'ঠিক। কিছুর একটা অপেক্ষায় আছে।'

এদিক-ওদিক নজর রাখছি হঠাৎ দেখি ছাতের ওপর পাঁচ-সাতটা পাঁপড়ের মোড়ক এসে পড়ল। আসমান থেকেই যেন পড়ল পাঁপড়গুলো, তারপর হারিয়ে গেল পাঁপড়ওয়ালার পাঁপড়ের মাঝখানে। হনুমানটা মোড়কগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাতে নেমে পাঁপড়ের ভেতর ছুটে গিয়ে তোলপাড় শুরু করে দিল। তছনছ করতে লাগল সব পাঁপড়। বেশ কটা করে একসঙ্গে মুখে দেয় কিছু চিবোয় কিছু ফেলে দেয়, ভালো করে দেখলে বোঝা যায় হনুমানটা পাগলের মতন খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে আসমান থেকে নেমে আসা পাঁপড়গুলোকে। খুঁজতে গিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে ছাতের বাকি পাঁপড়।

আমরা দেখতে চেষ্টা করছিলাম পাঁপড়ের মোড়কগুলো এলো কোথা থেকে! আমাদের নজরে পড়ল পাশের ফ্ল্যাটবাড়ির ছাত থেকে একটা লোক একটু ঝুঁকে পড়ে এইদিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার পরনে একটা ঝলমলে লাল রঙের শার্ট। চুলগুলো কদমছাঁট করে কাটা। গণেশ বলল, 'ওই মোড়কের পাঁপড় খানিকটা পেতেই হবে গুপ্ত। একটা টুকরো আমি দেখে রেখেছি। কিন্তু আমাদের এখন বেরোনো চলবে না। আততায়ীর কড়া নজর আছে ছাতের ওপর। আমাদের চিনে রাখবে।'

গণেশের কথা শেষ হবার আগেই, কথামতন পাঁপড়ওয়ালা আর দুজন লোক লাঠি হাতে তেড়ে এল হনুমানটার দিকে। হনুমানটা এদিক-ওদিক খানিকটা ছোটাছুটি করে একলাফে বটগাছে উঠল। ফ্ল্যাটবাড়ির মুখটাও অদৃশ্য হলো। আমরা ট্যাঙ্কের পাশ থেকে বেরিয়ে দৌড়োলাম হনুমানটাকে ফলো করার জন্য। গণেশ নিচু হয়ে তুলে নিল ওর দেখে রাখা মোড়কের পাঁপড়ের টুকরোটা।

(চলবে)

ছবি: সুধীর কুমার সামন্ত

জানা-অজানা

মহসীন মল্লিক

নাকের বদলে নরুণ

টাইকো ব্রাহে ছিলেন ষোড়শ শতকের একজন নামকরা বিজ্ঞানী। কিন্তু বড়ই তর্কবাজ ও বদমেজাজী ছিলেন। একবার একজনের সঙ্গে অংক নিয়ে শুরু হলো তর্ক। তর্ক থেকে তা গড়িয়ে গেল ডুয়েলে। তলোয়ারে-তলোয়ারে ঝনঝনাৎ। প্রচণ্ড লড়াই। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের খোঁচায় তাঁর নাক গেল কেটে। ঘটনাটি ঘটেছিল টাইকোর উনিশ বছর বয়সে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে। বাকি ছত্রিশটি বছর সেই বিজ্ঞানীকে কাটাতে হয়েছিল নকল নাক ব্যবহার করেই।

Suk—July-3

বিশ্বের প্রথম মহাকাশ পর্যটক

সুরভি বসু

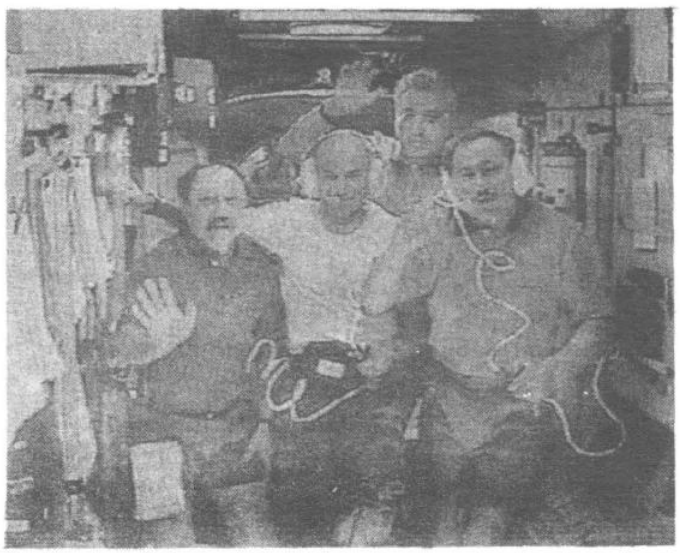

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন প্রথম মহাকাশ পর্যটক ডেনিস টিটো (মধ্যিখানে)।

ডেনিস টিটো ব্যবসায়ী। ছোট-খাটো নন, একেবারে কোটিপতি। ব্যবসার হাজার ঝক্কি, হাজার ঝামেলা সামলে তিনি মনে মনে লালন করে এসেছিলেন একটি সাধ—একদিন না একদিন তিনি পাড়ি দেবেনই পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে মহাশূন্যে। সেই সাধ আজ সার্থক কারণ পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ পর্যটক হিসেবে টিটো কাটিয়ে এসেছেন ২৮ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত পাক্কা আটটি দিন। থেকেছিলেন ১৬টি উন্নত দেশের পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে তোলা 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন' বা আই এস এস-এ।

যাওয়াটা কিন্তু মোটেই সহজ হয়নি তাঁর পক্ষে। তিনি নিজে আমেরিকার (ক্যালিফোর্নিয়া) নাগরিক হলেও খোদ নাসার কাছ থেকেই বার বার বাধা পেয়েছেন। তাঁর নাকি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই, বিপদ ঘটলে বা যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটলে তাঁর পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না বলে বাধার প্রাচীর তোলে নাসা। অথচ টিটো কিন্তু ওদেশের বিখ্যাত অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। পাঁচ বছর কাজও করেছেন নাসার গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন মহাকাশ অভিযান প্রকল্পে। এমনকি মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে মারিনার মহাকাশযান পাঠাবার সময় পথনির্দেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তবুও নাসার আপত্তি।

টিটোকে সাহায্য করতে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল রাশিয়া। নাসায় তাঁর কাজকর্ম দেখে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা অভিমত দিলেন যে মহাকাশে যাবার পক্ষে টিটো সব দিক দিয়েই উপযুক্ত। টিটোকে তাঁরা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন মস্কোর বিখ্যাত ইউরি গ্যাগারিন নভশ্চর শিক্ষাকেন্দ্রে। প্রশিক্ষণ চলল আট মাস। ঠিক হলো টিটোর সঙ্গে যাবেন দুই অভিজ্ঞ রাশিয়ান নভশ্চর কমান্ডার তালগাত মুসাবেইভ ও ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ইউরি বাতুরিন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল টিটোকে নিয়ে যাওয়া হবে মির-এ। এটি রাশিয়ার পনেরো বছরের পুরনো নিজস্ব স্পেস স্টেশন। কিন্তু মির-এর ব্যয়ভার এত বেশি হয়ে উঠেছিল যে এ বছরের ২২ মার্চ ওই স্টেশনটি ধ্বংস করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের জলে নিক্ষেপ করা হয়। তারপরই ভ্রমণের জায়গাটি ঠিক হয় আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন। এই বহুজাতিক স্টেশনে যেখানে সকলে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী সেখানে রাশিয়ার প্রার্থীকে পাঠাতে কোনো আপত্তি টেঁকেনি।

সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে ২৮ এপ্রিল কাজাখস্তানের বায়কোনুর মহাকাশ বন্দর থেকে সয়ুজ রকেটটি যাত্রা করে মহাশূন্যে। ডেনিস টিটোর ইচ্ছাপূরণের সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে ভ্রমণের কল্পনাটিও বাস্তবে পরিণত হয়। ফিরে আসার আগের দিন আই এস এস-এ বসে ভিডিও যোগাযোগের সাহায্যে টিটো পৃথিবীর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন স্টেশনটির বিষয়ে সারা পৃথিবীতে প্রচার করে রাশিয়া আই এস এস-এর দারুণ উপকার করেছে।

টিটো ও তাঁর সহযাত্রীরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন ৬ মে রবিবার। কাজাখস্তানের প্রান্তরে নিরাপদে অবতরণের পর উচ্ছ্বসিত টিটো বলেন, মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে ফিরে এলাম। দারুণ ল্যান্ডিং হয়েছে। অবশেষে আমার স্বপ্ন সার্থক করতে পেরেছি।

মনের সাধ পূর্ণ করতে টিটোকে কত দিতে হয়েছে জান? কুড়ি মিলিয়ন ডলার। টিটোর মহাকাশ ভ্রমণে যে 'মিরকরপ' কোম্পানিটি সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এবং সব ব্যবস্থা করে দেয় তার অন্যতম অংশীদার এক প্রবাসী ভারতীয় শিখ, নাম ডাঃ চিরঞ্জিভ বাবু

কাথুরিয়া।

টিটোর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ব্রিটেনের ম্যাডসেন পিরি ঠিক করেছেন তিনিও বেড়াতে যাবেন তারাদের রাজ্যে। তাঁরও ছোট থেকে মহাকাশ সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল। মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্ররা তাঁকে মুগ্ধ করে রাখত। তাই আট বছর থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। আর একটু বড় হবার পর বাড়িতে তৈরি টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখতেন। মহাকাশে গিয়ে তারাদের কেমন দেখায় তা প্রত্যক্ষ করার তাঁর বহুদিনের সাধ। সাধ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে মহাকাশে গিয়ে শূন্য ডিগ্রি গ্রেভিটিতে ভেসে বেড়ানো। পিরির সব সাধই এবার পূর্ণ হবে। 'স্পেস অ্যাডভেঞ্চার' নামে মহাকাশে বেড়াতে নিয়ে যাবার একটা সংস্থা তাঁকে তাঁর স্বপ্নরাজ্য থেকে ঘুরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে তাঁর পৃথিবী প্রদক্ষিণ হবে আংশিক। সুতরাং ভ্রমণের সময়কাল টিটোর ভ্রমণকাল থেকে কমই হবে। টাকা লাগবে এক লক্ষ ডলার। টিটোর মতো আট মাসের

তিনিও বেড়াতে যাবেন তারাদের রাজ্যে।

প্রশিক্ষণও লাগবে না, এক সপ্তাহের প্রস্তুতি নিলেই চলবে। তবে যতক্ষণ না মহাকাশে যাবার পক্ষে উপযুক্ত যান তৈরি হচ্ছে এবং তা ভ্রমণ সংস্থাটির ছাড়পত্র পাচ্ছে তত দিন পর্যন্ত পিরিকে অপেক্ষা করতেই হবে। সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ শুরু হতে হতে সেই ২০০৩ সাল।

জানো কী!

- দত্তরা কলকাতার বনেদী স্বর্ণকার। এই পরিবারের সংগ্রহে ছিল বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য রত্ন। বাড়ির কর্তা মারা যাওয়ার পর সেগুলি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে তিন ভাই গিয়ে হাজির হলেন গোয়েন্দা জিপিডি-র কাছে.....
- হীরের বাক্স নিয়ে ঝুনঝুনওয়ালা গাড়িতে উঠে বসলেন রানীমা আর দেওয়ানজীর সঙ্গে। গাড়িতে দেওয়ানজী রুপোর ডিবে খুলে তবকে মোড়া এক খিলি পান খেতে দিলেন ঝুনঝুনওয়ালাকে। পান চিবোতে চিবোতে তিনি ঢলে পড়লেন দেওয়ানজীর কোলে.....
- বিয়েবাড়িতে হুলুস্থূল। এক জোড়া হীরের দুল পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িভর্তি আত্মীয়-স্বজন। সবাই দেখেছে বিয়ের গয়না, কিন্তু কে নিতে পারে? কনের মামা রাজীব সি বি আই অফিসার। তাকেই ধরে পড়ল সকলে.....
- পুলিশ লাইনের কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ মহাজন। তাই তিনি লাহিড়ী মশাই-এর কাছে নিজে গিয়ে হাজির হলেন একটা বিশেষ অনুরোধ নিয়ে.....

এই সব রহস্যের সমাধান হবে **শুকতারার ভাদ্র** সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও এমন সব গোয়েন্দা গল্প যা সত্যি-গোয়েন্দাদেরও চমকে দেবে। এছাড়া খেলা, কুইজ, বিজ্ঞান.....হাঁদা-ভোঁদা-বাঁটুলরা তো আছেই।

গল্প হলেও সত্যি

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইংরেজিতে বলে টার্নিং পয়েন্ট। বাংলায় সন্ধিকাল অর্থাৎ মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যাবার মুহূর্ত। কোন দিকে ঘুরছে? মানুষকে ভালোবাসার দিকে, মানুষের সেবা করার দিকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'শিবজ্ঞানে জীবে সেবা' করো। স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই প্রায়োগিক আকার দিয়ে বললেন, 'ব্যবহারিক বেদান্ত'। আমরা অহরহ তার উদাহরণ চোখের সামনে দেখতে পেলেও মনে রাখি না। কিন্তু সেসব ঘটনা ও দৃষ্টান্ত থেকে যায় আমাদের চিন্তার আড়ালে। ঘটনাগুলো গল্পের মতো হলেও সত্যি। সেই রকমই কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে গল্প হলেও সত্যি শিরোনামে। কখনো কোনো সাধু বা সাধিকা কিংবা সাধারণ মানুষ অথবা বাহাদুরের মতো কোনো অনাথ বালকের জীবনের ঘটনাগুলি সাধারণ হলেও অসাধারণ হয়ে অনেক মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতেও দেবে।]

হরিজনের হরি

ছেলেটির নাম সুব্রায়ন। তার বাড়ি কেরলের একটি গ্রামে। পড়াশোনার তাগিদে সে শহরে এসেছে। সেখানে সে শুনেছে কেরলের দুটি পাহাড়ী গ্রাম আদুর আর নূরনাদে কুষ্ঠরোগের জ্বালায় মানুষরা অতিষ্ঠ। সেখানে হরিজনদের বাস। ধনীলোকেরা তাদের ক্রীতদাসের মতো খাটায়।

পড়াশোনা শেষ হলে, সুব্রায়ন একদিন কাউকে না জানিয়ে নূরনাদ গ্রামে হাজির হলো। দেখল শ'য়ে শ'য়ে কুষ্ঠরোগী রোগযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাদের দেখাশোনার কেউ নেই। ব্রিটিশ সরকারের একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে—সেখানেও ধর্মবিচার। আগে রোগীদের খ্রিস্টান হতে হবে, তবে তারা চিকিৎসা পাবে। সে আরো দেখল, গ্রামের বৃদ্ধ, শিশু, যুবা—সকলেই ধনীদের ক্রীতদাস। নামমাত্র বেতনে ধনীলোকেরা হরিজনদের সারাদিন খাটাচ্ছে। পানীয় জল আনতে তাদের যেতে হয় দু'মাইল দূরে। কারণ অর্থবানরা তাদের পুকুরে হরিজনদের জল নিতে দেয় না। এ দৃশ্য দেখে সুব্রায়ন অস্থির হয়ে পড়ল।

ছাত্রাবস্থায় সুব্রায়ন স্বামীজীর পত্রাবলী পড়েছে। তখন থেকেই তার মনে সেবা করার আগ্রহ। দেশের অবস্থা দেখে সে সংসার ত্যাগের সংকল্প নিল। কেরলের মিশন শাখায় ব্রহ্মচারী হয়ে কাজ শুরু করল। সেই কাজের উদ্যোগে সে একদিন নূরনাদে আবার হাজির হলো। অযাচিতভাবেই সে কুষ্ঠরোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। ক্রমে সেখানে একটি আশ্রম গড়ে তুলল। সেই সঙ্গে একটি বিদ্যালয়, যাতে জংলী পাহাড়ী মানুষগুলো শিক্ষার আলো পায়। এই আশ্রম থেকেই নূরনাদের অধিবাসীরা শিক্ষা, চিকিৎসা ও রুজিরোজগারের পথ পেতে লাগল।

নূরনাদে আশ্রম গড়ে তোলার পর সুব্রায়ন আদুর গ্রামের দিকে যাত্রা করল। সে জানত আদুর গ্রাম হরিজন অধ্যুষিত। সেখানেও ধীরে ধীরে ঐ হরিজনদের নিয়ে একটি আশ্রম কুটির বানাল। তারপর হরিজন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে লাগল। সেই সঙ্গে নানা কারিগরী শিক্ষাতেও তাদের পারদর্শী করে তুলল। ক্রমে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠল।

নূরনাদ আর আদুরের এই সেবার কাজে মাঝে মাঝেই সুব্রায়নকে শহর-মুখে পাড়ি দিতে হতো। নানা পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সে ঐ দরিদ্র পল্লীবাসীদের কল্যাণে তা ব্যয় করত। সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থের সামান্যতমও সে কখনো নিজে গ্রহণ করেনি। নিজে পরত শতচ্ছিন্ন কাপড়। শয়ন করত একটি জীর্ণ কম্বলে। কখনো মাথায় বালিশ দেয়নি সুব্রায়ন। হরিজনদের ছেলেরা যখন লেখাপড়া শিখে শহরে কাজে যেত তখন সুব্রায়নের কী আনন্দ! তার এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখে হরিজন তরুণদের মনে খুব কষ্ট হতো। তারা বলত, 'মহারাজ, আপনাকে এই ভাবে দেখলে আমাদের কষ্ট হয়।' উত্তরে সুব্রায়ন বলত, 'আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার ঘর, সুখ কী?'

সুব্রায়নের অন্তিমকালে নূরনাদ আর আদুর গ্রামের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি সকলে সমবেত হয়েছিল সেখানের আশ্রমে। তারা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সকলে। সুব্রায়ন সম্পর্কে তারা বলে, 'উনি হলেন হরিজনদের হরি।' সুব্রায়ন চলে গেল। সেই আশ্রমে হরিজনরাই তার প্রতিকৃতি সাজিয়ে রেখেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির নিচে। এই সুব্রায়নই হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ত্যাগ-ব্রতী বিবেকানন্দময় সন্ন্যাসী স্বামী নৃসিংহানন্দ।

(তথ্যসূত্রঃ শারদীয়া সমাজশিক্ষা, ১৪০৩)

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

শ্রাবণ মাস। ভরা বর্ষা। রোদ্দুর উঠলেই ভ্যাপসা গরম। এক একদিন রাস্তায় জলটল জমে একাকার কাণ্ড। কিংবা টানা বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে বেরুনোই বন্ধ। স্কুলে 'রেনি ডে'। এইরকম দিনে ছোটবেলায় আমরা কাগজের নৌকো বানিয়ে জলে ছাড়তাম। জলের টানে নৌকো যে কোথায় চলে যেত। এক সময় মেঘের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে পড়ত। আমরা জোর গলায় চেঁচাতাম, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এল বান.....

আমি জানি, এসব কথা শুনলে তোমাদের হাসি পায়। তাই না! বৃষ্টির দিনে বাড়িতে থাকলে তোমরা হয় টিভি খুলে বসবে নয়তো কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কমপিউটারে সার্ফিং শুরু করবে। তা তোমরা যতই ঐসব কর না কেন, একবার ভাবো দেখি, সন্ধ্যে হতে না হতেই চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টিমটিম করে জ্বলছে হ্যারিকেন, সেই আলো-আঁধারিতে ঠাকুমার কোলের কাছে বসে যখন ভূতের গল্প শুনতাম তখন ভয় আর মজা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা আনন্দের হাট বসে যেত। সে আনন্দ টিভি কিংবা কমপিউটার কোনোদিনই দিতে পারবে না।

থাক ওসব কথা। আজও কিন্তু গ্রামের দিকে কোথাও কোথাও এই পরিবেশ আছে। বৃষ্টির পর সোঁদা গন্ধ ছাপিয়ে সেখানে বাতাসে ভাসে চাঁপা ফুলের গন্ধ। গাছতলায় আলপনা দেয় ঝরা বকুল। নানা রং-এর দোপাটি আর জিনিয়া বাগান আলো করে থাকে। বাতাসে মাথা নাড়ে রজনীগন্ধা। জুঁই আর কামিনী ফুলের গন্ধে চারদিকে ম-ম করে। কদম গাছ ভরে যায় ফুলে ফুলে। প্রকৃতি সাজে অপরূপ সাজে। কে বলে বর্ষাকাল সুন্দর নয়!

এরই মধ্যে যদি কোনোদিন সন্ধ্যের পর আকাশ পরিষ্কার পাও তাহলে দেখতে পাবে শ্রবণা নক্ষত্রকে মাঝ আকাশে! এ মাসের নাম তো ঐ নক্ষত্র থেকেই। পশ্চিম আকাশে কর্কট আর মিথুন রাশিকে আর দেখতে পাবে না। তার বদলে পুব আকাশে উঁকি দিয়ে দেখবে মকর রাশিকে। ছায়াপথও চলে এসেছে আকাশের প্রায় মাঝামাঝি। রাত ফুরিয়ে গেলেই সূর্যদেবের ঘুম ভেঙে যায়—ঘড়িতে তখন ঠিক ৫টা বেজে ৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ড। তারপর সারাদিন মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলে পাটে বসেন ৬টা বেজে ২১ মিনিট ৭ সেকেন্ডে। এ সব কী তোমরা লক্ষ্য করো? নিশ্চয়ই করো। না করলে প্রকৃতিকে চিনবে কী করে। দেখেছো তো চারদিকে কেমন সবুজের সমারোহ। বৃষ্টির জলে চান-টান করে গাছ-পালা কেমন ঝলমল করছে। পাখিরা খুশিতে ডাকছে। ময়ূর পেখম তুলে নাচছে। সেই সঙ্গে মাঠে মাঠে পড়ে গেছে চাষের ধুম। রোয়া ধান তুলে নিয়ে চলছে বোনার কাজ। বৃষ্টির মিষ্টিজল পাবে আর চারাগাছগুলো লকলক করে বেড়ে উঠবে। তারপর একদিন মাথায় সোনালী ধান নিয়ে বাতাসে দোল খাবে। শুকতারার বন্ধুরা দু'চোখ ভরে এ সব দেখে নাও। ভগবান চোখ দুটো দিয়েছেন তো এইসব দেখার জন্যেই। মনে রেখো, প্রকৃতির চেয়ে বড় শিক্ষক আমাদের আর কেউ নেই।

তোমরা নির্ঘাৎ ভাবছো, দাদুমণির আজ হলো কী! তাই আর নয়। এবার তোমাদের চিঠির ঝাঁপি খোলাই বোধহয় ভালো!

তমালিকা দাস (প্রযত্নে—কল্যাণ দাস, পি এস হোম, পোঃ + গ্রাম দক্ষিণ গড়িয়া, দঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩৬১৩)

উত্তর ঃ অত মন খারাপ করছো কেন? একবার অঙ্ক পরীক্ষা খারাপ হয়েছে তো কী হয়েছে। এক কাজ করো, মন দিয়ে অঙ্ক কষে ভালো রেজাল্ট করে সকলকে দেখিয়ে দাও। আজ যাঁরা তোমায় বকছেন, দেখবে তাঁরাই তোমায় কতো আদর করবেন, প্রশংসা করবেন। তখন কিন্তু দাদুমণিকে জানাতে ভুলো না।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী (গ্রাম তামালতলা, পোঃ আজিমগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ-৭৪২১২২)

উত্তর ঃ দেখো কাণ্ড! তোমার চিঠি যখন হাতে এল তখন তো তোমার H.S. পরীক্ষা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে। দেখলে তো পরীক্ষাকে কখনো ভয় পেতে নেই। তুমিই বলো না, পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ কি? আমি তো বলবো, তোমরাই পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ। তোমরা মানে কিন্তু 'মানুষ'।

সুমিত সাহা (১০২/৪, এন এস রোড, এ বি গার্ডেন (সাহা বাড়ি), শেওড়াফুলি, হুগলি)

উত্তর ঃ তুমি ঠিকই ধরেছো। জর্ডন নদীতে মাছ নেই। আসল কথা হলো ঐ নদী বেয়ে যদি জীবন্ত কিছু এসে ডেডসিতে পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।

গণেশ চন্দ (জি কে কেয়ার অ্যান্ড কিওর, শহিদ ক্ষুদিরাম সরণী, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর)

উত্তর ঃ খুব ঝামেলায় ফেললে যে। দাদুমণির চিঠি বড় করার জায়গা কোথায়? দাদুমণির চিঠি তোমার ভালো লাগে জেনে আমারও ভালো লাগছে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

শ্রীপর্ণা সাহা, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, কে. ভি. এন. এস. মন্দির, শ্রীরামপুর, হুগলী

ভাল কে

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা
আষাঢ় মাসে রথ,
রথ দেখতে যাব আমি
কে যে চেনাবে পথ!
লেজ নাড়িয়ে বলে পুষি,
চিন্তা তোমার নাই,
আমি তোমায় পথ চেনাব
মাংস যদি পাই।
তাই শুনে বলল টম,
খোকন সোনা ভাই
আমিই তোমায় নিয়ে যাব,
কিচ্ছুটি না চাই।

অর্ঘ্য চৌধুরী,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
মদনপুর বালক বিদ্যালয়,
নদীয়া

স্বাধীনতার শপথ

স্বাধীনতা নয় শুধু
খেলা আর ছুটি,
স্বাধীনতা আমাদের
রুজি আর রুটি।
স্বাধীনতা আমাদের
নিশ্বাস ও জল,
আমরাই স্বাধীনতা
করবো সফল।

বৈদেহী রায়,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল,
কলকাতা

গল্প

গল্প গল্প আর
শুধুই গল্প।
গল্প কি আর
হয় অল্প?
গল্পে রাজা, গল্পে প্রজা,
গল্প লেখা দারুণ মজা।
গল্প যায় হারিয়ে
সব কিছু ছাড়িয়ে,
আবার আসে ফিরে
নতুন গল্পের ঝুড়ি নিয়ে।

শতাব্দী চ্যাটার্জী,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল,
কলকাতা

সুকন্যা বসু,
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী,
এ. জি. চার্চ স্কুল,
আসানসোল, বর্ধমান

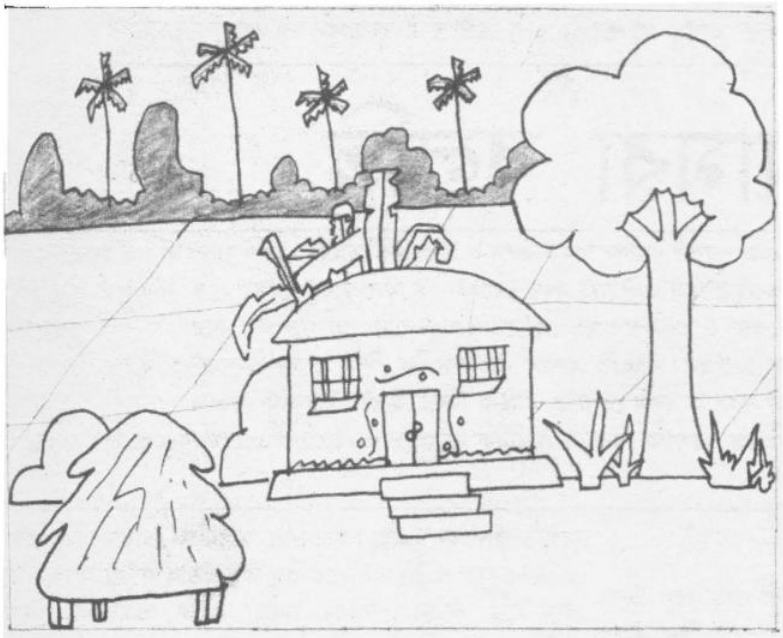

দেবাঙ্গিতা দাস, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির, কলকাতা

লিখব ভেবে

খাতায় আমি লিখব ভেবে,
লিখছি একটা পদ্য
অনেক ভেবে কিছুতেই,
আসছে নাকো শব্দ।
রেগে গিয়ে কলমটাকে,
যেই না দিলাম ছুঁড়ে
অমনি যত নতুন শব্দ,
মাথায় আসে উড়ে।
কলম দিয়ে লিখে ফেললাম,
শব্দগুলি যত
দেখলাম শেষে পদ্যটা যে,
হয়েছে মনের মতো।
বড়রা সব বলল দেখে,
হয়েছে খুব খাসা
'শুকতারা'তে ছাপা হবে,
এটাই আমার আশা।।

শ্রীপর্ণা মিত্র, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস স্কুল কলকাতা

দাদা

দাদার ওপর বাবা ভীষণ রেগে আছেন। হাফ ইয়ারলির রেজাল্টটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি কি ভেবেছ জীবনটা এভাবেই চলবে? মা সকালের জলখাবার এনেছিলেন, তাঁকে চড়া গলায় বললেন, নিয়ে যাও ও সব। মা খুব আস্তে বললেন, নাম করে এনেছি। আজকের দিনটা খেয়ে নিক। রেজাল্টটা মেঝেয় উড়ছিল সেটা তুলে দাদার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দাদা গুম হয়ে বসেছিল। মা বললেন, একটু ভাল করে চেপে পড় না বাবা, দেখছিস তো দিনকাল! ভাল ভাল ছেলেরা চাকরি পায় না। নে এবার খেয়ে নে। কিন্তু দাদা উঠে দাঁড়াল, বলল, আমার ভবিষ্যত নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। বলে বেরিয়ে গেল।

দাদা যাবার পর বাড়িতে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা নেমে এল। বাবা বলে উঠলেন, আজ অফিস যাব না, একটা হেস্তনেস্ত করব। মা যেভাবে আমাদের ভোলান সেইভাবে বললেন, বেরোবার সময় মাথা গরম করো না, আজ আমি ওর পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেব। বাবা রাজী হলেন না। জামা-কাপড় ছেড়ে দাদার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন হাতে বেল্ট নিয়ে। মার রান্নায় তেমন মন নেই, আমি মনে মনে বললুম, হে ঠাকুর, দাদাকে বাঁচাও।

একটা বাজল, দাদা তখনও ফিরল না। মা সদর দরজার সামনে দাদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। দাদা তবু এল না। একটা খরগোশ পুষেছিল দাদা। সারাদিন ছাড়া না পেয়ে সে ছটফট করছিল। তাকে বের করে ঘাস খেতে দিলাম। বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। দাদা তবুও ফিরে এল না।

পুজো চলে এল। শীত এল। দাদার গাছগুলির পাতাগুলো শুকিয়ে গেল। একদিন সকালে খরগোশটি মারা গেল। মায়ের চোখে চশমা উঠল। বাবার সব চুল পেকে গেল। তবুও দাদা এল না। দাদার বন্ধু শঙ্করদা ডাক্তারি পড়তে গেছে। পার্থদা চাকরি পেয়েছে। সেই বেল্টটা যেটা দিয়ে বাবা দাদাকে মারতে চেয়েছিলেন সেটা এখনও জানালায় ঝুলছে। গায়ে সাদা সাদা ছাতা ফুটেছে।

কিছুদিন বাদে বাবাও আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাবার মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর আমি আর মা রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা বনপথ ধরে দাদা আর বাবা পাশাপাশি হাঁটছেন। বাবার ডান হাত দাদার কাঁধে। দাদা হাসতে হাসতে বলছে, দেখ বাবুসোনা, আমি কত ভাল ছেলে হয়ে গেছি।

বিবেকানন্দ ঘোষ, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, সেন্ট মেরিজ স্কুল, দমদম

তিথি দাস, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, আইহো উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বিষয় ঃ ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বনাম পাশ্চাত্য রাগ সঙ্গীত ঃ কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির

আমরা বলছি

[*বিদ্যালয়-পরিচিতি ঃ এই বিদ্যালয় দমদম পার্কের বাসিন্দাদের নিরলস ও ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়। যেহেতু দমদম পার্ক তখন কৃষ্ণপুর মৌজার মধ্যে অবস্থিত ছিল তাই সেই সময় থেকেই এই বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে 'কৃষ্ণপুর' যুক্ত হয়ে আছে। এখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুধু বালকেরা ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে বালক-বালিকারা পড়াশুনা করে। বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সম্প্রতি এখানে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অনুমোদিত যন্ত্রগণক বিজ্ঞান (কম্পিউটার সায়েন্স) চালু হয়েছে। তাছাড়া নবম ও দশম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যন্ত্রগণক বিজ্ঞান পড়ানো শুরু হচ্ছে শীঘ্রই। এছাড়াও পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যন্ত্রগণক বিজ্ঞানে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ ও সাধারণ প্রয়োগ-বিদ্যালাভের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।—হরিশসাধন চন্দ্র*]

প্রথম

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং এয়ৎ সঙ্গীত-মুচ্যতে' অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তিন কলার সমাহার বা একত্র সমাবেশই হলো সঙ্গীত। সঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে একটি চারুকলা। মানুষের সঙ্গে সঙ্গীতের প্রাণের বা আত্মার সম্পর্ক। প্রকৃতির হাত ধরে মানুষ তার সঙ্গীত জগতের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সেদিক থেকে মানুষের সঙ্গীতকে "প্রকৃতির সঙ্গীত" বলা যায়। সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আত্মবিকাশ সাধন ও চিত্ত বিনোদন। আত্মবিকাশসম্পন্ন মানুষ হতে গেলে সঙ্গীতের বোদ্ধা হতে হবে। দ্বিতীয়ত, মনোরঞ্জনের অনুরূপ কোনো সরল অথচ সুন্দর পথ দ্বিতীয় নেই। উপযুক্ত শিল্পীমাত্রই সঙ্গীতের মাধ্যমে আনন্দ বিতরণে সক্ষম হন। অপর দিকে সঙ্গীতের সহ্যগুণ হলো এই যে তা মনের মালিন্য, গ্লানি, নিরাশা প্রভৃতি দূর করে, আশা এনে দেয়, এনে দেয় ভক্তি উদ্দীপনা। যিনি যথার্থ সঙ্গীতসাধক, তিনি মানবজীবনের চরম পথের লক্ষ্যে অবিচল, তিনি মহামুক্তির চিরপ্রয়াসী এবং সচ্চিদানন্দানুভূতির একান্ত অভিলাষী।

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত মূলত বেদ থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন ঋষিদের সামগানের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতীয় সঙ্গীত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মিশ্র কিছু সঙ্গীতধারার সৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতধারার মূল ধারাটি হলো হিন্দুস্তানী ও দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত। একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা মার্গ সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক সঙ্গীত। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত মূলত শাস্ত্রীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ও শাস্ত্রানুমোদিত সুর, তাল, লয় প্রভৃতি দ্বারা ছন্দোবদ্ধ। অপরদিকে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতধারা মিলে গজল, টপ্পা প্রভৃতি যেসব সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে তা হলো আনুষঙ্গিক সঙ্গীত। মার্গ সঙ্গীতের ধ্রুপদীয় গাম্ভীর্য এই আনুষঙ্গিক সঙ্গীতের মধ্যে আংশিক পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার আঞ্চলিক সঙ্গীতগুলিকে দেশজ সঙ্গীত বলা হয়। এই সঙ্গীতগুলি আঞ্চলিক ভাষায় গীত হয়। এগুলির মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিছু কিছু প্রভাব অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। কীর্তন, কবিগান, তরজা, বাউল, ভাটিয়ালী, ঝুমুর, গম্ভীরা, সারি, বিহু, ভাওয়াইয়া, সাঁওতালী, পাঁচালী প্রভৃতি দেশজ সঙ্গীতের উদাহরণ।

বর্তমান যুগে বিদেশী সঙ্গীতের যে দুর্দমনীয় ঢেউ ভারতের ওপর বারবার আছড়ে পড়ছে তারই অন্যতম হলো পপ সঙ্গীত। মূলত বিদেশী সুরের ওপর ভিত্তি করেই এই সঙ্গীতের জন্ম। বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে দেশজ সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক সঙ্গীতের সুরও এতে গৃহীত হচ্ছে। এই সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি মানব-মানবীর চিত্তকে উদ্দীপিত করে। এতে বাদ্যযন্ত্রের যে বহুল ব্যবহার ও শব্দের বিভিন্নতা এবং দ্রুত ছন্দ পরিলক্ষিত হয় তা আমাদের মনকে আনন্দ দেয় ও রক্তে তুফান তোলে। শরীর ও মন এর ছন্দে দুলে ওঠে। আধুনিক ভারতের শ্রবণযোগ্য গণমাধ্যমগুলি এই সঙ্গীতের প্রচারে নিয়োজিত। ভারতের যুবসমাজ এই সঙ্গীতের রসে নিজেদের নিমজ্জিত করেছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত ও পপ সঙ্গীতের মধ্যে প্রায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ভারতীয় সঙ্গীত পৃথিবীর অন্যতম আদিম সঙ্গীত। বেদ-ভিত্তিক এই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো (ক) Aesthetic বা সৌন্দর্যমূলক এবং (খ) Spiritual বা আত্মিক উন্নতি সাধন। ভারতীয় সঙ্গীত মানুষের মনোরঞ্জন করে এবং আনন্দানুভূতি প্রদান করে। কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এই সঙ্গীত মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করে, মানুষকে এক চিরন্তন ভাবের জগতে নিয়ে যায়।

অপরদিকে পাশ্চাত্য পপ সঙ্গীত শুধুমাত্র আমাদের মনোরঞ্জন করে, ক্ষণিকের মাদকতায় আমাদের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু ভাবতন্ময়তা দান করতে পারে না, পারে না স্বর্গীয় অনুভূতি প্রদান করতে, পারে না মনকে সবকিছুর উর্ধ্বে নিয়ে অমৃতলোকে স্থাপন করতে। আধুনিককালে বিশেষজ্ঞরা একমত যে ভারতীয় সঙ্গীতের

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। কিন্তু পপ সঙ্গীতের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। ভারতীয় সঙ্গীত মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটিয়ে তাকে শান্তি, মৈত্রীর পথে চালনা করে প্রাণের উদ্দীপনা ও শক্তির বিকাশ ঘটায়। অপরদিকে পপ সঙ্গীত ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দানে এবং মনের তাৎক্ষণিক স্ফূর্তি যোগাতে সক্ষম হলেও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যাওয়ায় অসমর্থ। তাই ভারতীয় সঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে "Music for Soul" হয়ে পাশ্চাত্য পপ সঙ্গীতের লাস্যময়ী জগতের বহু উর্ধ্বে বিচরণ করে।

মানবমনের গভীরতম স্তরে পৌঁছানোর ভিত্তিতে ভারতীয় সঙ্গীত অগ্রাধিকার লাভ করলেও বর্তমান পৃথিবীর দ্রুতগামী সমাজে ক্ষণিকের অনন্দদানকারী পপ সঙ্গীতই প্রাধান্য পাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীত সাধারণত বেশ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সময়ের হিসাবী সমাজ পপ সঙ্গীতে আকৃষ্ট। বৈদেশিক সঙ্গীতের আক্রমণে ভারতীয় সঙ্গীত এখন কোণঠাসা।

অনুভব পালিত
দ্বাদশ শ্রেণী

দ্বিতীয়

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বহু প্রাচীন। ভারতীয় রাগ সঙ্গীত মূলত খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, গজল আধারিত। ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা শুরু হয় আমির খসরুর সময় থেকে। পরবর্তীকালের মোগল যুগ থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রকৃত জয়যাত্রা শুরু হয়। আকবরের সভাসদ তানসেন ছিলেন সেযুগের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। এরপর শাহজাহানের সময় থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাশাপাশি খেয়াল গানের পুনরুত্থান হয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও এই প্রবাহ ছিল অব্যাহত।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ঘরানার রাগসঙ্গীত যথা গোয়ালিয়র ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, পাতিয়ালা ঘরানা, আগ্রা ঘরানা তার বৈচিত্র্য, রস ও আঙ্গিকে রাগ সঙ্গীতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। খাম্বাজ, দাদরা, কাহারবা, বসন্ত, কাফী, মল্লার, কেদার, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী সঙ্গীত যাঁদের কণ্ঠের মাধুর্যে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই সমস্ত কিংবদন্তী শিল্পী হলেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ, কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত, উস্তাদ ফৈরাজ খাঁ, উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও বড়ে গুলাম আলি।

যন্ত্রসঙ্গীতে যাঁরা ভারতীয় রাগ সঙ্গীতকে জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষের বিচারে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে উস্তাদ বিলায়েত খাঁ, রবিশঙ্কর, আমজাদ আলি খাঁ, রাধিকামোহন মৈত্রর মতো গুণী শিল্পীদের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীতও এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ইংরেজ আমলেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতচর্চা এদেশে শুরু হয়েছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জনক হিসাবে যাঁরা সমগ্র বিশ্বে পরিচিত তাঁদের মধ্যে বীটোভেন, মোৎসার্ট, বাখ এবং হেডেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত জার্মান সুরকার বীটোভেন তাঁর আবেগপূর্ণ সঙ্গীত রচনার জন্য ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ মোৎসার্ট মাত্র ৬ বছর বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন।

Classical Western Music-এর হাত ধরে যে নতুন আঙ্গিকের সঙ্গীত আত্মপ্রকাশ করেছিল 1950-এর দশকে তা হলো Rock Music। এই সঙ্গীতই জনপ্রিয়তার খ্যাতিতে Pop Music নামে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়।

Pop সঙ্গীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীরা হলেন এলভিস প্রেসলি, চাকমেরী, বব ডিলান ও বর্তমানের মাইকেল জ্যাকসন ও ম্যাডোনা।

ভারতীয় রাগ সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রে ভিন্ন হলেও আবহমান কাল ধরে একে অপরের সাহায্যে ও প্রভাবে উৎকর্ষতার শিখরে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত আর. ডি. বর্মন, সলিল চৌধুরী, এ. আর রেহমান-এর মতো সঙ্গীত পরিচালকদের নাম করা যায় যাঁরা তাঁদের সঙ্গীতে পাশ্চাত্য প্রভাবের উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। উভয় সঙ্গীতের মধ্যে এই আদান-প্রদানই সঙ্গীত জগৎকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

দীপান্বিতা রুদ্র
দ্বাদশ শ্রেণী

এজেন্ট চাই

কলকাতা সহ বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত সবরকম বই ও ম্যাগাজিন বিক্রির জন্যে প্রতিষ্ঠিত এজেন্ট / কমিশন ভিত্তিক লোক চাই।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ম্যানেজার, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফিরেদেখা

খেয়ালের খেলায়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে তিনশ বছর আগের কথা। হল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহর ডেলফট। শহরের টাউন হলের চৌকিদার আধবুড়ো লেউবেন হুক। তার কাজ সারাদিন বসে বসে শুধু টাউন হল পাহারা দেওয়া। কাজ নেই, কম্ম নেই, শুধু বসে থাকা। ভালো লাগার কথা নয়। হুকেরও লাগতো না। সে ভাবতো, কিছু একটা তাকে করতে হবে। কিন্তু কী করবে? সেইটাই সমস্যা।

লেউবেন হুক বড় খেয়ালী মানুষ। সে শুনেছিল চশমার কাচ তৈরি করে যারা তারা নাকি কাচ ঘষে ঘষে আতস কাচ তৈরি করে। আতস কাচের মধ্যে দিয়ে কিছু দেখলে তা অনেক, অনেক বড় দেখায়। ব্যাপারটা বেশ মজার। লেউবেনের ইচ্ছে, সেও আতস কাচ তৈরি করবে। ক'দিন ধরে চশমাওয়ালাদের কাছে ঘোরাঘুরি করল। ধন্না দিলো। কিন্তু কেউ তাকে আতস কাচ তৈরি করার কায়দা শেখাল না। শেখাবেই বা কেন! এ যে তাদের ট্রেড সিক্রেট।

লেউবেনের মাথায় ঢুকেছে সেই খেয়াল। আতসকাচ সে তৈরি করবেই। কেউ না শেখায় তো শেখাবে না। সে নিজেই বের করে নেবে আতস কাচ তৈরির কায়দা। কিন্তু কী করে? লেখাপড়া তো কিছু জানে না।

লেউবেন খেয়ালী হলেও একরোখা। কেউ যে তাকে পাত্তা দেয় না, তা সে জানতো। সে অবশ্য ও সবের পরোয়াও করতো না।

তা লেউবেন কাচ ঘষতে ঘষতে একদিন সত্যিই আতস কাচ তৈরি করে ফেলল। তারপর আর তাকে দেখে কে! সে দেখেছে, বাজারে যে সব আতস কাচ পাওয়া যায় তার চেয়ে তার আতস কাচে সব কিছু আরও বড়, আরও পরিষ্কার দেখা যায়। লেউবেন যত দেখে ততই অবাক হয়। সারাদিন শুধু বসে বসে আতস কাচ তৈরি করতে লাগল সে। নানা ধরনের, নানা আকৃতির আতস কাচ। লোকে তাকে পাগল বলতে লাগল। বলুক গে। যার যা ইচ্ছে তাই বলুক। সে পরোয়া করে না। সারারাত লেউবেন বসে বসে আতস কাচের নিচে এটা-ওটা রাখে আর দেখে জিনিসটা কত বড় দেখাচ্ছে।

কিছুদিন ধরে ওর মাথায় অন্য একটা ধারণা ঘুরছিল। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে ওর দেখতে আরও সুবিধে হয়। তাই লেউবেন আতস কাচটাকে একটা পেতলের পাতে আটকে, কাঠের ফ্রেমে দাঁড় করালো। এবার দেখতে খুব সুবিধে হয়েছে।

সেদিন লেউবেন একটা মাংসর দোকানের সামনে দিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। ছাগলের একটা চোখ পড়ে আছে সেখানে। কী মনে হলো, লেউবেন সকলের অলক্ষে চোখটা তুলে নিলো। এবার সে তার আতস কাচের তলায় ফেলে ছাগলের চোখটার দিকে তাকিয়েই অবাক। ছাগলের চোখে এত সুন্দর কারুকাজ! ছবির মতো আঁকা কত কী। অথচ সাদা চোখে তো এ সবের কিছুই দেখা যায় না।

সারারাত ধরে লেউবেন তাই দেখল। তারপর ফুল-পাতা থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল, ফুলের কেশর—যা হাতের কাছে পায় তাই তার আতস কাচের তলায় ফেলে দেখতো আর অবাক হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতো। নিজের মনে কথা বলতো। সকলে ধরে নিলো লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

লেউবেনের মেয়ে মারিয়া তখন কিশোরী। সে তো বাবার হাবভাব দেখে থ।

হঠাৎ একদিন লেউবেনের মনে হলো, হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই তো সে তার আতস কাচের নিচে ফেলে দেখছে। কোনোদিন তো জল নিয়ে দেখেনি। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। এক ফোঁটা বৃষ্টির জল এনে আতস কাচের তলায় রেখেই সে আঁতকে উঠল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। এ সে কী দেখছে? অজস্র ছোট ছোট প্রাণী সেই এক ফোঁটা জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে। কী জোরে ছুটছে! তাদের শুঁড় রয়েছে, লেজ রয়েছে। ওরা কারা?

ভয়ে চিৎকার করে উঠল লেউবেন, মারিয়া, শীগগির আয়.....দেখে যা কী সাংঘাতিক কাণ্ড.....

বাবার চিৎকারে মারিয়া ছুটে এল। দেখল, তার বাবা প্রলাপ বকছে, এ কী দেখলাম! ওরা কী সাংঘাতিক.....

বাবার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যায় মারিয়া। বলে কী হয়েছে বাবা? ঐরকম করছো কেন?

করব না? একবার তাকিয়ে দেখ। এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের মধ্যে কী সাংঘাতিক কাণ্ডই না ঘটছে!

মারিয়ার ধারণা, তার বাবার আতস কাচের ঐ যন্ত্রটা ভুতুড়ে। সে ওটার ধারে কাছে ঘেঁষে না। বাবার কথায় সে দেখার চেষ্টা করল। কিচ্ছু দেখতে পেল না। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কই কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! সব অস্পষ্ট, কিছুই দেখা যায় না।

কই, দেখি, দেখি.....কী বলছিস তুই? দিব্যি দেখা যাচ্ছে। সব পরিষ্কার, সবই জীবন্ত।

বাবার খামখেয়ালি আচরণের জন্য মারিয়াকে ভুগতে হয়। সে বিশেষ পাত্তা দিলো না।

লেউবেন হুক তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। বলল, জানিস মারিয়া, আমি বোধহয় একটা বিশেষ কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি।

সত্যিই তাই। জীবাণুদের অদৃশ্য জগৎ সেই প্রথম একজন মানুষের চোখে ধরা পড়ল। অদৃশ্য জীবাণু আবিষ্কার মানুষের আধুনিক জগতের প্রথম ভিত্তি। দুটি ভিত্তিস্তম্ভের ওপর আধুনিক সভ্যতার ইমারত গড়ে ওঠে। তার একটি জীবাণুতত্ত্ব, অন্যটি বিদ্যুৎ।

হল্যান্ডের ছোট্ট একটি শহরের এক অশিক্ষিত চৌকিদার নিজের খেয়ালের খেলায় যে মুহূর্তে প্রথম এক ফোঁটা জলে জীবাণুর প্রত্যক্ষ দর্শন পায়, আমাদের আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে সেই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় গৌরবে বিরাজ করছে। চিরকাল করবেও। অথচ লেউবেন হুকের নাম বিশেষ কেউ জানে না। বড় বড় আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানীদের তালিকাতে লেউবেন হুকের নামটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানব সভ্যতার ভিত্তি সেদিন গড়ে দিয়েছিলো হল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহরের আধবুড়ো খেয়ালী চৌকিদারটি। আধুনিক সভ্যতা তাই সেই মানুষটির কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ছবি : সুফি

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্রশ্ন ঃ আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রতিবছর পরীক্ষায় প্রথম থেকে পঞ্চমের মধ্যে স্থান পাই। আগে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানের মধ্যে থাকতাম। এখন ক্রমশই আমার ফল যেন খারাপ হয়ে উঠছে। বেশিক্ষণ একটানা পড়তে পারি না। মনের মধ্যে নানা কথা, নানা চিন্তা এসে ভিড় করে।

কিছুদিন আগে আমি এক জ্যোতিষীর কাছে আমার হাত দেখাই। তিনি আমাকে মুক্তো ও পলা হাতে ধারণ করতে বলেছিলেন। আমি বিশ্বাস করে ধারণ করি। আমার এখন মনে হচ্ছে যেন এই পাথরগুলি ধারণ করার জন্যই আমার এরকম হচ্ছে। আমার ছোটবেলায় এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে যে কোনো কোনো সময়ে আমি আমার নিজের অস্তিত্বকেই খুঁজে পাই না। আমার মাঝে মাঝে ভীষণ একা লাগে। আমি আমার মনের কথা আমার বন্ধুদের বলতে চেষ্টা করি, কিন্তু বলতে পারি না। আমার বাবা ও মা'র মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। দাদু-দিদার কাছ থেকেও নানাভাবে আঘাত পাচ্ছি। আমি ভীষণ মানসিক কষ্টে ভুগছি। কেউ আমাকে বুঝতে পারে না। এই অবস্থায় আমি কী করব? দয়া করে তাড়াতাড়ি উত্তর দিন।— নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর ঃ তোমার হাতের লেখা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো (Organised)। একটি বানানও চিঠিতে ভুল নেই। পড়াশুনায় তোমার বেশ ভাল হওয়ার কথা। স্কুলে তোমার পরীক্ষার ফলও মোটামুটি ভাল—প্রথম থেকে পঞ্চমের মধ্যে তোমার স্থান থাকে—এ সবই ভাল। কিন্তু কোথায় প্রথম আর কোথায় পঞ্চম—এতটা হেরফের হবে কেন? এটা সুলক্ষণ নয়, এটার কারণ প্রধানত তোমার আত্মবিশ্বাসের অভাব। যার আত্মবিশ্বাস কম তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও (Autonomy) কম। আর সেইজন্যই মন যে কোনো আপাত আয়াসী চিন্তার স্রোতে ভেসে যায়। দৃঢ়মনা হয়ে সংযত চিত্তে পড়ায় মন দিতে পার না? নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস না রেখে তুমি miracle-এ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ এই বয়সে। আত্মপ্রত্যয়, অধ্যবসায় ও একাগ্র নিয়মিত পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পাথর পরলে তোমার ভাল হবে ভেবে পরলে, পরার পর মনে হচ্ছে, পাথরগুলোর জন্যই তোমার খারাপ হচ্ছে। তোমার নিজের কর্ম-সামর্থ্য ও মেধার প্রতি আস্থা নেই বলেই তুমি এই বয়সেই জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হচ্ছ। এটা ঠিক নয়। বিজ্ঞান মানসিকতায় স্থিত হও। এই পরিমণ্ডলে সবকিছু কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত—কোনো কিছুই হঠাৎ করে (accidentally) ঘটে যায় না। যেটাকে accident বা ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তারও আপাতঅদৃষ্ট নিহিত কোনো কারণ থাকে। প্রকৃতির সবকিছুই প্রায় নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। কাজেই আচমকা তোমার ভাল হবে বা খারাপ হবে এরকম ভাবার কোনো বিজ্ঞাননিষ্ঠ কারণ নেই।

তোমার চিঠি থেকে মনে হচ্ছে তোমার শৈশবকালে এমন কিছু ঘটেছে, মনে হয় বিপর্যয়কারী পারিবারিক সম্পর্ক, যার ফলে একটা প্রায় অসুস্থ করে ফেলার মতো একাকীত্বের বোঝা তোমার মনের উপর চেপে বসে বা বসেছে। একটা বড় কারণ তো তুমি বলেছ, তোমার বাবা-মা'র মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিভেদ। এই অবস্থা মনের উপর গভীর কালো ছায়া ফেলে। এ তো তোমার মন-খারাপের চোরাবালি। যেখানেই পা রাখছ সেখান থেকেই পা পিছলে যাচ্ছে। শক্ত মাটির মনোভূমি একান্ত কাছের একান্ত আশ্রয় বাবা-মা'র মধ্যে সুসম্পর্ক থেকে গড়ে ওঠে। তোমার ক্ষেত্রে তোমার বাবা-মা'র ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক তোমার মনকে বিষণ্ণ শূন্যতায় ভরে দিচ্ছে আর তা থেকেই তোমার মনের জোর চলে যাচ্ছে—আত্মবিশ্বাসের অভাবে শীর্ণকায় নদীর মতো দুর্বার স্রোতে, দুর্বার সাহসে ভর করতে পারছ না। শৈশব ও কৈশোরকালের কোমল মন যে স্নিগ্ধ স্নেহ প্রীতি ভালবাসা চায়—মনের গাছে জলসিঞ্চনের মতো। তোমার দাদু-দিদাও তোমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার মাঝে মাঝে করেন না, লিখেছ। এ সবের উপর তোমার তো কোনো হাত নেই। তুমি তো আর এঁদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তুমি তো এখন বড় হচ্ছ, বাবা-মাকে বোঝাও, বাবা-মা অন্যায়ভাবে উদাসীন স্বার্থপরতায় তোমাকে ভুলে যেতে চাইলে রুখে দাঁড়াও। তোমারও তো কন্যা হিসাবে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বাঁচার অধিকার আছে। দাদু-দিদিমাকেও বল তোমার একাকীত্ব দুঃখের কথা। অন্য আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে এঁদের বোঝাও—সুসম্পর্কের বিমল বাতাসে তুমি আবার বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারবে, তোমার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে, তোমার পড়ায় মন বসবে, তোমার পরীক্ষার ফলও উত্তরোত্তর ভাল হবে।

হাঁদা-ভোঁদার

অপহরণ

পকেটের অবস্থা দেখেছিস, ভোঁদা! দুটো ফুচকা খাবো সে অবস্থাও নেই।
আমারও তো একই হালত, হাঁদা! কিন্তু তোর মাথায় তো নানা রকম আইডিয়া বেরোয়, বের করনা একটা।

হ্যাঁ, কিছু একটা করতেই হবে! আসছে-আসছে রে, ভোঁদা!
ভোসছে তাহলে। একটু জলদি নিয়ে আয়, হাঁদা!

ইউরেকা! পেয়ে গেছি!
কি-কি পেয়েছিস রে, হাঁদা?
অপহরণ!
মানে!

মানে, বাগানের এই মালপত্র রাখার ঘর থেকে টেলিফোনে পিসেমশাইকে জানাবো যে তুই অপহৃত হয়েছিস।
তারপর-

কিছু পরে-
-পিসেমশাইয়ের কাছে মুক্তিপণ চেয়ে টেলিফোন যাবে। হিঃ হিঃ!

বিজনেস পার্টনারের ফোন এজোক্ষণে এলো বোধহয়।
কুলুলুকুং!
কুলুলুকুং!

হ্যালো!
শুনুন! আমরা হাঁদা-আর ভোঁদাকে অপহরণ করেছি। পঞ্চাশহাজার টাকা মুক্তিপণ দিলে ওদের ছাড়া হবে। কোথায় টাকা দিতে হবে পরে টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি-

-দক্ষিণপাড়ার ফুটবল খেলার মাঠের ধারে একটা পোড়ো মন্দির আছে, আপনি ওখানে টাকা নিয়ে যাবেন। পুলিশে খবর দেবেন না-

ওদিকে-
ওধার থেকে যা বলছে বলুক-এইভালে আমি একটু তালাস করে দেখি। মনে হয় যে কাছাকাছি থেকেই কেউ একাজে করেছে।
একি!
আশ্চর্য! এখান থেকে কে আবার ফোন কানেকশান করলো! দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা!
তার দেখছি জানলা গলে বাইরে গেছে!
সর্বনাশ! ছেলে দুটোকে কারা যে অপহরণ করলো! আবার এদিকে কে আমার ফোনের লাইন ট্যাপ করে নিয়ে আমার ফোনের বিলের অঙ্ক বাড়াবার বন্দোবস্ত করেছে! এতো সাংঘাতিক ব্যাপার!
একি! এতো দেখছি আমার বাগানের মালপত্র যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে তার ঢুকেছে!
পুলিশে খবর দিলে ওরা লাশ হয়ে যাবে। তাই কিছু ফাঁস না করে একশো টাকার নোটে টাকাটা আনবেন।
আমার কান ধরে টানছে কে র‍্যা-
আ-আ-ইরক!
গরর! হভচ্ছাড়া, চামচিকে! আমারই টেলিফোনে অপহরণের গল্প ফেঁদে চিট করে আমার থেকেই টাকা আদায়ের ধান্দা
এবার এই টেলিফোন দিয়েই তোকে চিট করে ছাড়বো বিটলে বদমাশ কোথাকার!

সেদিনের সাক্ষী ব্যান্ডেল ব্যাসিলিকা

শুভব্রত ভট্টাচার্য

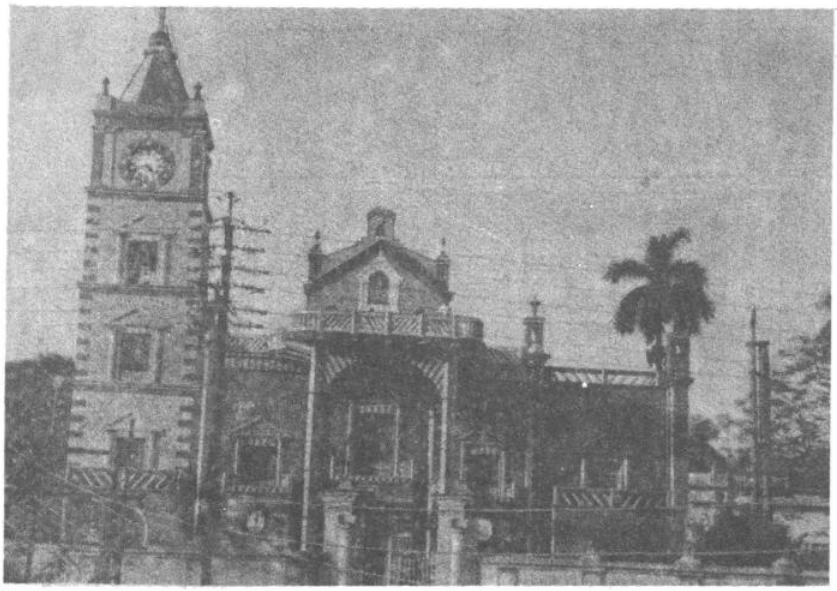

সরস্বতী নদী ক্রমাগত শুকিয়ে যাওয়ায় হতশ্রী হয়ে পড়ে সে যুগের বিশ্বখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম। তাই সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে পর্তুগীজ বণিকরা বাবুগঞ্জ, পিপুলবাটি, ব্যান্ডেল প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি শহর পত্তন করে। শহরটির নাম দেওয়া হয় 'উগোলিম'। ক্রমে উচ্চারণের সুবিধার্থে 'উগোলিম' পরিণত হয় 'হুগলী'তে। শেষে এখানেই কেন্দ্রীভূত হলো বাংলাদেশের বাণিজ্য।

ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন মিশনারীরা। সপ্তগ্রামে বসতি স্থাপন হতে তাঁরা সেখানেও এসেছিলেন। হুগলী শহর পত্তনের কিছুদিন পরেই 'আগস্টিনিয়ান' মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। এইভাবে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের এক শুভ মুহূর্তে শহরের উত্তরে ব্যান্ডেল গ্রামে স্থাপন হলো 'ব্যান্ডেল গীর্জা', এখন যার নাম 'ব্যান্ডেল ব্যাসিলিকা'।

সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীর পর্তুগীজদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চললেও শাহজাহান রাজনৈতিক কারণে পর্তুগীজদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। বাংলার নবাব কাশিম খাঁ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সম্রাটের আদেশে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন তিনি ব্যান্ডেল আক্রমণ করেন। ৩১ জুলাই ব্যান্ডেলসহ উত্তরাংশের পর্তুগীজ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পতন ঘটে এবং হুগলী দুর্গ আক্রান্ত হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর খ্রিস্ট ভক্তগণ যখন উপাসনায় রত তখন মেল্লোর নামে এক বিশ্বাসঘাতক পর্তুগীজের পরিচালনায় মোগল সৈন্যগণ গোপনে দুর্গে প্রবেশ করে নারকীয় হত্যালীলা চালায়। পাঁচজন আগস্টিনিয়ান ধর্মব্রতীর মধ্যে একমাত্র ফাদার মোয়াও দা ক্রুজ কোনোক্রমে রক্ষা পান। কিন্তু ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে আরও কয়েকজন বন্দী খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য। ফাদার ধর্মত্যাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁর উপর শুরু হয় চরম নির্যাতন। তীব্র বিষ মিশ্রিত খাদ্য দেওয়া হয় ফাদারকে। ঈশ্বরের কৃপায় বিষ পরিণত হয় অমৃতে। বিস্মিত হন সম্রাট। তিনি স্থির করেন ক্ষিপ্ত হাতির পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হবে ফাদারকে। কিন্তু বৃদ্ধ ফাদারের সামনে এসে হাতি থেমে যায়। শুঁড় তুলে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে নিজের পিঠের উপর তুলে নেয়। এই দৃশ্য দেখে সম্রাট যুগপৎ ভীত ও মুগ্ধও হন। তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্তি দেন ফাদার ক্রুজ ও তাঁর সঙ্গীদের। এক ফর্মান জারি করে ব্যান্ডেলে ৭৭৭ বিঘা জমি দান করেন ফাদারকে।

ব্যান্ডেল গীর্জাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। প্রবেশপথ এবং আশ্রমের প্রধান ফটক নদীর দিকে। প্রধান বেদী উত্তরাংশে স্থাপিত, দক্ষিণ দিকের দালানটিকে 'আগস্টিনিয়ান হল' বলে। গীর্জার সম্মুখভাগ গ্রীসের ডরিক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। গীর্জার মধ্যস্থলটি ২২ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার চওড়া। পাশের অংশটি ২২ মিটার লম্বা ও প্রায় ৫ মিটার চওড়া। গীর্জার সুবিশাল মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেদীমূলের উঁচু প্ল্যাটফর্ম শ্বেতপাথরে মোড়া হয়। বর্তমান প্রধান বেদীটি মার্বেল পাথরের তৈরি। এই মার্বেল পাথর ইতালি থেকে আনা হয়েছে। প্রাচীন বেদীটি ছিল কাঠের, তৈরি হয়েছিল ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। এই বেদীটি 'জপমালা' মাতা মারীয়ার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। যীশুকে কোলে নিয়ে মাতা মারীয়ার এই মূর্তিটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগাল থেকে আনা হয়েছিল। প্রধান বেদীর বাঁ দিকে যীশুর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও একটি বেদী আছে। গীর্জা প্রতিষ্ঠার সময় বেদীটি ছিল কাঠের। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে একদিন হঠাৎ

বেদীতে আগুন লাগে আর এটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। পরে ভক্তদের দানে এটি পুনরায় তৈরি করা হয়। বেদীর ডান দিকে আছে সাধু যোসেফের মূর্তি। আর বাঁ দিকে দেওয়ালের গা কেটে জায়গা করে রাখা প্রয়াণের পর যীশুর শায়িত পূর্ণাবয়ব মূর্তি। প্রধান বেদীর ডান দিকে যে বেদীটি আছে সেটি সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈরি। ডন বস্কোর নামে উৎসর্গ হওয়ায় এর উপর ডন বস্কোর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে গীর্জা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় 'সালেসীয়' ধর্মসংঘের উপর। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডন বস্কো। গীর্জার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ঘণ্টাঘর আছে, এটির উচ্চতা ৩২ মিটার। ঘণ্টাঘরের চূড়ায় একটি ক্রুশ স্থাপিত আছে। এখানে তিনটি ঘণ্টা আছে। গীর্জার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের প্রাঙ্গণে আছে সমাধিক্ষেত্র।

বাইরের দিকের উঁচু অলিন্দে আছে মাতা মারীয়ার মূর্তি। এই মূর্তিকে 'শুভযাত্রার মাতা' বলা হয়। ফাদার মোয়াও দা ক্রুজের এক অন্তরঙ্গ পর্তুগীজ বন্ধু, যিনি পেশায় ছিলেন বণিক, মাতা মারীয়ার এই মূর্তিটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মোগল সৈন্যরা ব্যান্ডেল আক্রমণ করলে তিনি মূর্তিটি বুকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। প্রায় ২২ বছর পরে এক গভীর রাতে গঙ্গাবক্ষে শুরু হলো প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। নদীর গর্জনে ক্রুজের ঘুম ভেঙে যায়, তিনি ভীত হন এবং স্মরণ করেন মাতা মারীয়াকে। মনে পড়ে ২২ বছর আগে হারানো মূর্তি এবং বন্ধুর কথা। ধীরে ধীরে নদীর গর্জন কমতে থাকে, সুদূর থেকে ভেসে আসে প্রিয় বন্ধুর কণ্ঠস্বর। মোয়াও চমকে ওঠেন। ঘরের জানলা খুলে দেখেন গঙ্গাবক্ষে এক উজ্জ্বল আলো। পরদিন ভোরে গঙ্গাতীরে চিৎকার শোনা যায়, 'গুরুমা' আবার ফিরে এসেছেন! মূর্তিটি গীর্জায় নিয়ে এসে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দের এক গ্রীষ্মের প্রভাতে একটি বিশাল পর্তুগীজ জাহাজ গীর্জার সম্মুখের ঘাটে এসে ভেড়ে। জাহাজের অধ্যক্ষ ফাদার ক্রুজকে বলেন তিনি তাঁর জাহাজের একটি মাস্তুল গীর্জায় দান করতে চান। ফাদার কারণ জিজ্ঞেস করলে অধ্যক্ষ জানান তাঁর জাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়ে যখন তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন তিনি মাতা মারীয়াকে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন, যদি তাঁরা রক্ষা পান তাহলে নিকটবর্তী গীর্জায় তিনি একটি মাস্তুল দান করবেন। 'শুভযাত্রার মাতা'র কৃপায় তাঁর জাহাজখানি রক্ষা পায়। তাই তিনি এসেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে। ক্রুজের ইচ্ছানুসারে অধ্যক্ষের দান করা মাস্তুলটি গীর্জার সম্মুখে স্থাপন করা হয়।

ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের এক ছোট্ট নগর 'লুর্ড'। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত পাঁচ মাসে মাতা মারীয়া বার্নাডেট নামে এক বালিকাকে এই স্থানে মোট আঠারোবার দর্শন দেন। দর্শনকালে তিনি বার্নাডেটকে বলেছিলেন নিয়মিত রোজারির মালা জপ করতে এবং পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত করতে। মাতা মারীয়ার পুণ্য আবির্ভাবে নির্জলা এই পার্বত্য স্থানে আশ্চর্যভাবে জলের প্রস্রবণ দেখা দিল যা আজও শুকিয়ে যায়নি। ব্যান্ডেল গীর্জায় পূর্ব দিকের বাগানে মাতা মারীয়ার মূর্তি ও গুহাটি লুর্ড-এর অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। এখানেও একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে প্রার্থনা করে অনেকেই সুস্থ হয়েছেন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে 'ফাতিমা' নামে একটি নগরে 'জপমালা'র মাতা মারীয়া দর্শন দেন এবং সবাইকে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে রোজারি জপ করতে আদেশ দেন। এঁরই স্মরণার্থে ব্যান্ডেল গীর্জার উত্তরে ধর্মসংঘ প্রার্থীদের প্রাঙ্গণে ফাতিমার মাতা মারীয়ার শ্বেতপাথরের মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে।

আবার প্রকাশিত হয়েছে ২০ বছর পরে

ঠানদিদির থলে

দাম ঃ ৫০ টাকা মাত্র

এই গল্পের বই-তে যে সব কাহিনী আর রূপকথাকে একত্র করা হয়েছে, তাদের বিশেষত্বই হলো, ছেলে, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের মনকেই তা আকর্ষণ করে, সকলের মনেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগায়। তার কারণ, এই সব গল্পের আবেদন শুধু শিশুর কাছে নয়, এসব গল্পের আবেদন হলো সেই চির-শিশুর কাছে, যা যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের মনেই বয়সের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এইখানেই গল্পগুলির সার্থকতা।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা চাই

শুকতারার বৈশাখ সংখ্যাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। নিরঞ্জন সিংহর কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রামপুরের মানুষখেকো' পড়ে খুশি হয়েছি। আমার ইচ্ছে, শুকতারায় একটি কল্প-বিজ্ঞানের সংখ্যা হোক।

কমলেশ কুমার

(প্রযত্নে—বিবেকানন্দ কুমার, গ্রাম-গহমী, পোঃ-রায়জামনা, হুগলি-৭১২১৩৪)

নববর্ষ সংখ্যা

নববর্ষ সংখ্যার প্রতিটি গল্পই আমার খুব ভালো লেগেছে। তার মধ্যে অনীশ দেবের 'জিহাদপুরের সেই লোকটা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রামপুরের মানুষখেকো', গৌরী দের 'উপহার', কিরণশঙ্কর মৈত্রর 'মেধা ও বিত্ত' গল্প ক'টি সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। মনের জানলা, মজার পাতা, তোমাদের পাতা, আমরা বলছিও খুব ভালো লাগে।

শ্রীপর্ণা মিত্র

(বাঙুর এভিনিউ, কলকাতা)

সবাই পড়ি

শুধু আমি নই, আমার বাবা-মাও শুকতারা পড়তে খুব ভালোবাসেন। যদি প্রত্যেক সপ্তাহে শুকতারার একটা করে নতুন সংখ্যা পেতাম তাহলে আরও ভালো লাগতো। শুকতারায় যদি বেশ কয়েকটা করে ভূতের গল্প, গোয়েন্দা গল্প ছাপা হয় তাহলে আরও ভালো লাগবে।

অনিকেত রায় প্রতিহার

(প্রযত্নে—গোধূলি রায় প্রতিহার, পোঃ-বড়জোড়া (হসপিটাল কোয়ার্টার, বাঁকুড়া)

আনন্দ পাই

প্রতি সংখ্যা শুকতারা পড়ে আমি আনন্দ পাই। গত চৈত্র সংখ্যায় রীণা চক্রবর্তীর 'আলুর দম', কুমুদবন্ধু চৌধুরীর 'শেয়াল রাজার জ্বর' ও বৈশাখ সংখ্যায় অমর রাউতের 'খেজুর রস' পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। শচীনের রঙিন ছবি ও হাসির সংখ্যা চাই।

অয়ন দাশগুপ্ত

(পি ৪০, সি আই টি রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১০)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

ফিরে পাওয়া

বহুদিন আগেকার কথা। একটি ছোট মেয়ে একদিন 'শুকতারা' নামে একটি পত্রিকা উপহার পেল। মেয়েটি সেই প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলল পত্রিকাটিকে। প্রতিমাসে সে আশা করে থাকে আর দিন গোনে কবে সে শুকতারা হাতে পাবে। তারপর তার মনে প্রবল বাসনা জাগে শুকতারায় লেখা পাঠাবার। সাহসে ভর করে সে কিন্তু লেখা আর পাঠাতে পারে না। মনের ইচ্ছে মনে চেপে রেখে সে একদিন বড় হয়, বিয়েও হয়। বিয়ের পর সে অনেক দূরে এক শহরে চলে যায়। প্রবাসেও সে কিন্তু শুকতারাকে ছাড়েনি। প্রতিমাসে সে নিজে পড়ত, ছেলেমেয়েদেরও পড়াত। তারপর একদিন তার জীবন থেকে শুকতারা হারিয়ে যায় কালের প্রভাবে। অনেক অনেকদিন পরে আবার সে তার শৈশবের বাসনাকে যেন নতুন করে অনুভব করে এবং শেষমেশ সত্যিই একটা গল্প পাঠায় তার একদা প্রিয় পত্রিকায়।

দিন কাটে। হঠাৎ একদিন দুপুরে পোস্টম্যান এসে তার হাতে দিয়ে যায় তার প্রিয় পত্রিকা শুকতারা। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে আজকের প্রৌঢ়া মহিলা আনন্দে অধীর হয়ে দেখে তার লেখা গল্পটি ছাপা হয়েছে চৈত্র সংখ্যার শুকতারায়। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে নতুন করে আবিষ্কার করে তার প্রিয় শুকতারা আজও আছে পত্রিকার আকাশে চির উজ্জ্বল হয়ে।

রীণা চক্রবর্তী

(জি. সি. $\frac{১৮}{৬}$ নারায়ণতলা, পশ্চিম বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯)

জিহাদপুরের সেই লোকটা

বৈশাখ সংখ্যায় অনীশ দেবের 'জিহাদপুরের সেই লোকটা' আমার খুব ভালো লেগেছে। লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

সৌরভ দেবনাথ

(প্রযত্নে—স্বপন দেবনাথ, কামাক্ষাগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

বৈশাখ সংখ্যা অপূর্ব

বৈশাখ সংখ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'তিন বুড়ি' কবিতা, অমর রাউতের 'খেজুর রস', গৌরী দের 'উপহার', নিরঞ্জন সিংহর 'মগলু কাহিনী', শুভমানস ঘোষের 'গোপালের পাটিসাপটা' আর বরুণ মজুমদারের 'বিচিত্র খবর' খুব ভালো লেগেছে।

কল্যাণী বসাক

(প্রযত্নে— প্রদীপ কুমার বসাক, গ্রাম-হাট সিমলা, পোঃ-সমুদ্রগড়, বর্ধমান)

দ্বিতীয় মাণিক্য

মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয় মাণিক্য' খুব ভালো লেগেছে। আমার অনুরোধ, গোয়েন্দা গল্প আরও বেশি করে দিন।

বিকাশ গড়াই

(গ্রাম-রাঁচী গ্রাম, পোঃ-কুলটি, কেন্দুয়া, বর্ধমান-৭১৩৩৪৩)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) .....

সম্পূর্ণ ঠিকানা .....

খুশির হাসি

বাণী রায়

নামটি ওর খুশি। বয়স বারো কি তেরো। অতটুকু মেয়ে কিন্তু মোটেই চঞ্চল নয়। ফুটন্ত ফুলের মতো সতেজও নয়। বরং উল্টোটি। মুখখানা সবসময়ই ভার ভার, বিষণ্ণ। খুশির মনে একটুও খুশি নেই। ওর বয়সী অন্য মেয়েরা কত চঞ্চল, কত উজ্জ্বল। খুশিরও ওদের মতো হতে ইচ্ছে করে কিন্তু পারে না। 'খুশি' নামটা ওর কে যে রেখেছিলেন! ঠাকুমা, বাবা না মা? ভাবে খুশি আপন মনে। স্বভাবের সঙ্গে একেবারে বেমানান ঐ নামের জন্য ঘরে-বাইরে কি কম কথা শুনতে হয় তাকে? শুনতে হয় ওর বাবা-মাকেও—'বাবা রে বাবা! তোমাদের খুশি কি একটুও মোটা হবে না'.....'খুশি সেই পাতলা ফড়িংটিই রয়ে গেল'.....'ফুঁ দিলে উড়ে যাবে যে'.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ তো গেল বাইরের লোকের কথা। আর ঘরে? 'ওর আর কিচ্ছু হবে না। পড়াশুনায় তো একেবারেই মন নেই।' বাবা-কাকা-মাসি-পিসি সবার মুখে এই এক কথা।

শুনে শুনে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যায় খুশির। একে তো সে প্রায়ই ভোগে। আজ জ্বর, কাল পেটব্যথা, পরশু কান কটকট—লেগেই আছে। তার ওপর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অষ্টপ্রহর মায়ের টিকটিক করা—'খুশি, খেতে বস.....ভালো করে খা.....দেরি করিস না.....' আসলে মা আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে খুশি ভালো থাকে, একটু মোটা হয়, আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মতো নীরোগ শরীর নিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। তাই সবচেয়ে 'ভালো'টি সবসময় খুশির পাতে।

এই রকমই চলছে। তার মধ্যে একদিন খুশির দাদা তাকে বলে, 'তুই গজেনবাবুর রাণুমাসিমার কথা জানিস?'

গজেনবাবুর পরিচয় ভালোভাবেই জানে খুশি। কারণ দুটো কাজে ওর খুব উৎসাহ, এক—গল্পের বই পড়া, দুই—গান গাওয়া। গায়ও ভালো। স্কুলের সব ফাংশানে তাই খুশির ডাক পড়ে। আর গল্পের বই পড়ার তো সময়-অসময়ও নেই, স্থান-অস্থানও নেই। বাবা কত বলেছেন, 'ওরে খাবার সময় অন্তত বইটা বন্ধ কর।' কে শোনে কার কথা। তাই দাদার কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে খুশি জিজ্ঞেস করে, 'গজেন্দ্রনাথ মিত্রর কোন বইটার কথা বলছিস রে দাদা? ছোটদের গল্প?'

'ঠিক বলেছিস।'

'কিন্তু ওর মধ্যে রাণুমাসিমা.....

'তার মানে ঐ গল্পটা তোর পড়া নেই।' দাদা উত্তর দিল, 'ওঁর ঐ রাণুমাসিমার প্রায় হাজারখানেক রোগ। তোর মতো রাণুমাসিমার পাতেও সব 'ভালো'টি। তবু রাণুমাসিমার প্রায় প্রায়ই এখন-তখন অবস্থা। এই নিয়ে তাঁর মায়ের সদা-সর্বদা সে কী উৎকণ্ঠা। তবে মায়ের তদারকিতে ভালো-মন্দ খেয়ে তিনি কিন্তু অনেকদিন বেঁচে ছিলেন এবং আরামেই ছিলেন। যদিও রোগা ছিলেন ঠিক তোর মতো। আসলে রাণুমাসিমার কোনো রোগ ছিল না। ছিল রোগের বাতিক বা ম্যানিয়া।'

দাদার কথার ধরনে খুশি মনে কষ্ট পায় বলে, 'অমন করে বলছিস কেন রে দাদা? আমি কি ইচ্ছে করে অসুখ বাধাই? অসুখ হলে কী করব? আসল কথা কি জানিস, আমার সব সময় খুব ভয় করে, পাছে আমার অসুখ হয়।'

'ওটাই তো তোর রোগ।' খুশিকে তার অসুখের উৎসটা যেন চিনিয়ে দিতে চায় দাদা, 'শুধু ভয় থেকেই তোর যত রোগ।'

একদম ঠিক কথা বলেছে দাদা। কিন্তু খুশি যে কেন ভয় পায় সেটা তো আর জানে না। একবার তার ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছিল। কিছুতেই ছাড়ে না। দু' একদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন বাবা। না সারতে নিয়ে গেলেন ডাক্তারকাকুর চেম্বারে। ডাক্তারবাবু আবার বাবার খুব বন্ধু। তার সামনেই বাবা ডাক্তারকাকুকে বললেন, 'ভালো করে দেখ তো ভাই। রোজই অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে। একে তো এই রোগা, খায়ও না ভালো করে। যা পলিউশন চারদিকে! ভালো করে লাঙ্স দুটো পরীক্ষা কর তো।' বাবার কথা শুনে তো তার বুক হিম হয়ে উঠেছিল। তবে কি.....টিভির দৌলতে সবাই জানে এ রোগের কথা।

ডাক্তারকাকু ওকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি ভালো করে দেখে-টেখে বললেন, 'না না, চিন্তার কোনো কারণ নেই, এটা দুর্বলতা থেকে হচ্ছে। খুশি মা, তুমি পেট ভরে খাবে, খেলবে, পড়াশোনা করবে। আমি তোমায় খিদে হবার জন্যে একটা টনিক লিখে দিচ্ছি। কোনো ভয় নেই তোমার।'

ভয় নেই বললেই কি ভয় যায়! সে কাঁদো কাঁদো হয়ে প্রশ্ন করে, 'কাকু, আমার কি টিবি হয়েছে?'

'দূর পাগল! টিবি হতে যাবে কেন? আচ্ছা বল তো এই অসুখের বাংলা নামটা কি?'

'জানি বলেই মনে হচ্ছে।' উত্তর দিয়েছিল সে, 'বোধহয় ক্ষয়কাশি।'

'বাঃ!' তারিফের ভঙ্গিতে বলেছিলেন ডাক্তারকাকু, 'ঠিক বলেছ। এ অসুখে ধীরে ধীরে শরীরের ক্ষয় হতে থাকে। সে লক্ষণ

তোমার একেবারেই নেই। তোমার ওজন আগে যা ছিল তাই-ই আছে। তাছাড়া কাশিও নেই। তাহলে ভয়টা কিসের? ভালো করে পেট ভরে খেতে হবে আর টনিকটা খেতে ভুলবে না।'

সেবার তো ডাক্তারকাকুর ওষুধেই জ্বর ছাড়ল। ওষুধ আর মা-বাবার যত্ন। বাবা রোজ নিজে বসে খুশিকে খাওয়াতেন। জ্বর ছাড়লেও খুশির ভয় কিন্তু গেল না। বাবার সেদিনের কথাগুলো ওর মনে গেঁথে আছে। কেবলই মনে হয় ঘরে-বাইরে, আকাশে-বাতাসে সর্বত্র রোগের বীজাণু বিজবিজ করছে। রাস্তায় কোনো রোগা-পাতলা মানুষ দেখলেই সবেগে সরে আসে। মনে হয় নিশ্চয়ই লোকটার টিবি হয়েছে।

অথচ ওরা যখন দেশের বাড়িতে ছিল তখন কি খুশির এত ভয় ছিল? ছিল না। সে তখন কত খেলেছে, কত বেড়িয়েছে। ভয় অবশ্য তখনও একটা ছিল। সেটা হলো ভূতের ভয়। তা সে তো ছোটবেলায় সবারই থাকে। দেশের বাড়িতে ওদের একটা মেটে ঘর আছে। জানালাহীন ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটার এক কোণে আছে মান্ধাতা আমলের একটা কাঠের সিন্দুক। সিন্দুকটার ঠিক পিছনেই থাকে 'কুনী' ভূতনী। ঘরটাতে খুশি কখনও একা ঢুকত না। অথচ ওখানে যে ওর স্বপ্নের কত জিনিস ছিল! একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর সারি সারি বসানো ছিল ঠাকুমার আমলের তোরঙ্গ। মাঝে-মধ্যে মায়ের সঙ্গে খুশি ঢুকত সেই ঘরে। মা চাবি দিয়ে তোরঙ্গ খুললেই বেরিয়ে পড়ত স্বপ্নের মতো সুন্দর সুন্দর সব খেলনা—কত পুতুল, কত চিনেমাটির হাঁড়িকুড়ি, ঝিনুকের খেলনা, কড়ি গাঁথা লক্ষ্মীর ঝাঁপি। মায়ের সঙ্গে ঢুকলেও ভয় থাকত মনে—এই বুঝি 'কুনী' ভূতনী নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল কালো লম্বা লম্বা হাত বের করে।

'কুনী' আর 'বুনী' ছিল দুই বোন। বুনী থাকত বনে আর কুনী থাকত ঘরের কোণে। একদিন কিভাবে যেন কুনী জানতে পারল বুনীর ছেলে হয়েছে। ব্যস, আহ্লাদে নাচতে নাচতে কুনী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। নাচছে আর বলছে, 'কোঁ দিঁবসের?' অর্থাৎ ছেলে কতদিনের হলো? এ সবই ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প। কত সুন্দর গল্প বলতেন ঠাকুমা। সেই থেকে 'কুনী' ভূতের ভয়টা পেয়ে বসেছিল তাকে।

তারপর বাবা কলকাতায় চাকরি পেতেই খুশিরা চলে এসেছে দেশ ছেড়ে। প্রথমটা চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল শহরের জাঁকজমক দেখে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সয়ে এল সবকিছু। বাবা খুশিকে একটা ভালো বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ঠাকুমা মাঝে মাঝে আসেন তাদের এই কলকাতার বাড়িতে। ভালোই ছিল খুশি। কিন্তু কলকাতায় যেন রোগের শেষ নেই। রেডিও, টিভিতে সবসময় রোগের বিবরণ শুনছে। শুনে শুনে কেমন যেন আতঙ্ক ধরে যায় খুশির মনে। সে আর কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। চারদিকে শুধু অসুখের বিভীষিকা দেখে।

কলকাতায় আসার পর থেকেই হঠাৎ হঠাৎ খুশি অসুখে পড়তে শুরু করল। ব্যস স্কুল কামাই। তারপর ডাক্তারকাকুর চিকিৎসায় সেরে উঠত, আবার স্কুলে যেত—এইভাবে চলতে চলতেই খুশি ক্লাস সেভেনে উঠল।

তারপরই ঘটল ঘটনাটা। হঠাৎ একদিন পেটের ডানদিকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হলো। সেই সঙ্গে বমিভাব, অখিদে। যেতেই হলো ডাক্তারকাকুর চেম্বারে। কাকু তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। বললেন, 'বিশেষ কিছু না, লিভারটা একটু বেড়েছে। রোজ তেতো আর হালকা ঝোল দিয়ে ভাত খাক। তবে হ্যাঁ, জলটা অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।' ওষুধও কিছু লিখে দিলেন তিনি।

দু'চার দিন স্কুলে গেল না খুশি। আবার যেতে শুরু করল। একদিন স্কুল যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে হঠাৎ গা পাক দিয়ে উঠল। বমিও হলো খানিকটা। খুশি খুব ভয় পেয়ে গেল। এরকম হচ্ছে কেন তার? ডাক্তারকাকু আবার এলেন, আবার নানাভাবে পরীক্ষা করলেন খুশিকে। শেষে বললেন ব্লাড, ইউরিন আর স্টুলটা পরীক্ষা করতে। যথাসময়ে রিপোর্ট এলে দেখা গেল সবই ভালো শুধু খুশির পেটে প্রচণ্ড কৃমি।

চিন্তায় পড়ল খুশি। এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে ভালো থাকছে না কেন! জল ফুটিয়ে খায়, সকাল-বিকেল টোস্ট আর সন্দেশ, ভাতের পাতে চারা মাছের ঝোল। তাতে কী-ই বা আর আনাজ থাকে! শুধু আলু, পটল, কাঁচকলা। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস খায় সে, উচ্ছে সেদ্ধ। মা গোটা উচ্ছে দু'ধার চিরে সেদ্ধ করে দেন।

হঠাৎ কি যেন মনে হয় খুশির। সে ছুটে গিয়ে ফ্রিজ খুলে আনাজপাতি বার করতে থাকে। মা অবাক হয়ে বলেন, 'কিরে, ওসব বার করছিস কেন?' খুশি বলে, 'একটা জিনিস দেখছি মা।' ছোট ছোট উচ্ছেগুলো সব কাঁচা, বঁটিতে কেটে দেখল—নাঃ কিচ্ছু নেই। পাকা উচ্ছেও রয়েছে কয়েকটা। তার একটা কাটতেই দেখে বিজবিজ করছে পোকা।

আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল খুশি। উচ্ছের ভেতর পোকা সে-ই খুঁজে পেয়েছে। একটা শিশিতে ভরে বাবাকে গিয়ে বলল, 'দেখ বাবা, এর জন্যেই বোধহয় আমার অসুখ করেছিল।'

সন্ধ্যেবেলায় এলেন ডাক্তারকাকু। সব শুনে কাকু ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'খুশি মার কী বুদ্ধি, উচ্ছের ভেতর থেকে পোকা বের করেছে। কেউ বুঝতেই পারেনি ওর ভেতরে পোকা থাকতে পারে। তবে আপনারা বলেন খুশির বুদ্ধি কম! কম তো নয়ই বরং অন্য অনেকের থেকে ওর বুদ্ধি বেশি।'

এরপর খুশির মাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'বৌদি, আপনাদের একটা কথা বলি। খুশির বুদ্ধি কম, কিচ্ছু হবে না, এ ধরনের কথা একদম বলবেন না। এসব শুনেই ও মনমরা হয়ে থাকে। তার ওপর আছে অসুখের ভয়। ওকে সবসময় হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করবেন, উৎসাহ দেবেন। ওর আসল রোগ যে কৃমি সেটা তো আগেই ধরা পড়েছে। তবে ওকে ওর এই উচ্ছে পোকা আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবেন না। এতে ওর আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ভালো থাকার আগ্রহও বাড়বে।'

চলে যাবার আগে ডাক্তারকাকু খুশিকে বললেন, 'খুশি মা, রোগের কারণটা তো তুমি নিজেই বের করে ফেলেছ। এত বুদ্ধি তোমার যে আমাকেও হারিয়ে দিলে। এসব এবার গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে দাও। অসুখ তো সব লোকেরই হয়, আবার সেরেও যায়। উচ্ছের ভেতর পোকা আবিষ্কারের জন্য আমি তোমায় দুটো গল্পের বই উপহার দেব। গল্পের বই তো তোমার খুব প্রিয়। তাই না? আর একটা কথা, তুমি তো গান গাও। রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা জান? 'আমি ভয় করব না ভয় করব না। দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না'। কোনোদিন যেন ভুলো না ওই গানটা।'

খুশি হাসছে। খুশির হাসি। মুখটা ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন সকালের রোদ এসে পড়েছে কচি পাতায়। হেলছে, দুলছে, ঝিলমিল করছে। খুশি ঠিক তেমনি ভাবেই বলল, 'যেটা আপনার পছন্দ সেই বইটা দেবেন কাকু।'

ছবি ঃ সুফি

জেন্টল জায়েন্টস

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

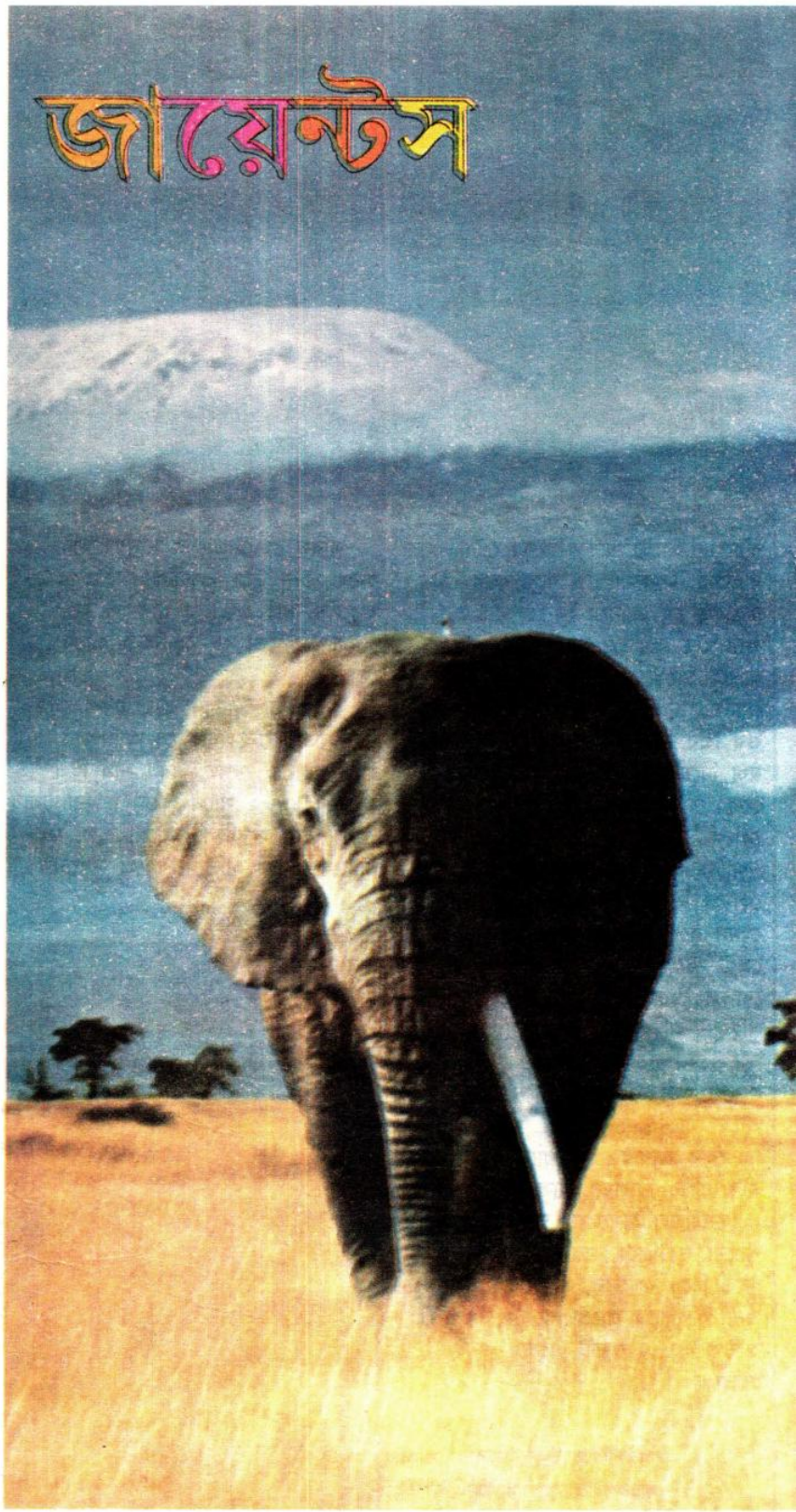

জাম্বো শব্দটির মানে জানা আছে নিশ্চয়। স্টোভিল ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে জিগ্যেস করলেন তাঁর সহকর্মী এবং প্রিয় বন্ধু মরিসকে। দীর্ঘ পথশ্রমে ওঁরা দুজনেই ক্লান্ত। তবে জঙ্গল ওঁদের সঞ্জীবনী। তাঁবুর আশ্রয়ই ওঁদের দেয় ঘরের আরাম। একটু আগে শেষ হয়েছে তাঁবু খাটানো। দুজন স্থানীয় মানুষকে ওঁরা এবার সঙ্গে রেখেছেন। হাতিদের আস্তানায় যেতে হবে ওদের সঙ্গে। তাঁবু খাটানো শেষ করে লোক দুটি বাইরে কাঁটাগাছের বেড়া দিচ্ছে যাতে রাতে হামলা করতে কেউ না আসে এদিকে।

সাদা গণ্ডারের ছবি এবং ফিল্ম তুলে ওঁরা এই মুহূর্তে কেনিয়ার সাভো ন্যাশনাল পার্কে। আফ্রিকার হাতিদের জীবন নিয়ে ওঁরা এবার তুলবেন একটি তথ্যচিত্র। কাজটিতে পরিশ্রম যেমন তেমনই রয়েছে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। দু'চারদিন ঘুরে ফিরে দেখতে সময় যাবে। পার্কটির আয়তন তো কম নয়। সুইজারল্যান্ড দেশটিকে অর্ধেক ভাগে ভাগ করলে যা হয় তারই এক অংশ জুড়ে তৈরি হয়েছে কেনিয়ার এই জাতীয় উদ্যানটি।

একটি ইজিচেয়ারে বসে কফির মগে মরিস চুমুক দিচ্ছিলেন। বাইরে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত আকাশের রঙ হয়েছে ডিমের কুসুমের মতো। জঙ্গলের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বনানীর সুরভি। কত রকমারি পাখির ডাক। তারা সকলেই ঘরমুখো। জঙ্গলের একদিক ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠছে। একটু পরেই আকাশে ফুটে উঠবে একটি-দুটি করে অজস্র তারা। বনভূমির মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন মরিস। এমন সময় স্টোভিল জিগ্যেস

গাছপালা খেয়ে ঘন জঙ্গল হাল্কা করে দেয় হাতি।

করলেন জাম্বো শব্দের অর্থ। স্টোভিলের ধারাটাই এরকম। প্রশ্ন করে করে তিনি কতকিছু যে জানিয়ে দেন। আর এর জন্য ওঁর প্রস্তুতিও চলে। ক্যাম্পের মধ্যেই রেখেছেন মোটা মোটা বই আর নোটস। মরিসের ওসব বেশি আসে না। ওঁর প্রিয় সাবজেক্ট ক্যামেরা। ক্যামেরার মধ্য দিয়ে তাঁর নিরন্তর প্রকৃতি পাঠ চলে। স্টোভিলের প্রশ্নের উত্তরে মরিস বললেন, জাম্বো মানে কে না জানে? শব্দটির অর্থ হলো বড়। খুব বড় যে কোনও জিনিসকেই জাম্বো বলা হয়। যেমন ধরো আমরা এখানে এলাম জাম্বো জেটে চেপে। আবার কোল্ড ড্রিংক্সের বোতল থেকে শুরু করে কাগজের সাইজ—অতিমাত্রায় বড় হলেই তাকে জাম্বো আখ্যা দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তা হয়। কিন্তু কেন? কেন জাম্বো মানেই বড়?

কেন আবার? অভিধানে আছে বলে। এটা একটা বিশেষণ, ব্যস।

স্টোভিল হাসলেন। তারপর একটি পুরনো ফটোগ্রাফ বার করে মরিসের হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখো, এর জন্য পৃথিবীতে জাম্বো শব্দের উৎপত্তি। অভিধানেও এ শব্দটি এসেছে এরই থেকে।

মরিস ফোটোগ্রাফার মানুষ। ছবি দেখে সটান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, মাই গড! এ ছবি কি করে পেলে? এ তো বহু বহু বছর আগে তোলা।

স্টোভিল বললেন, হ্যাঁ, একশ কুড়ি বছর তো বটেই। এই যে আফ্রিকার হাতির ছবিটি দেখছ, এরই নাম ছিল জাম্বো। ১৮৮২ সালে লন্ডন চিড়িয়াখানায় ওকে আনা হয়েছিল। জাম্বো ছিল, সে আমলের বন্দী হাতিদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। লম্বায় ১১ ফিট এবং ওজনে পাকা ৬,৬০০ কেজি। সে আমলে জাম্বোর জনপ্রিয়তা ছিল একেবারে গগনচুম্বী। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে লোকেরা আসতো ওকে দেখতে। ওর মুগ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে জাম্বো রোজ পেত অজস্র উপহার আর চিঠি। পিঠে চাপিয়ে সে দর্শকদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত চিড়িয়াখানার মধ্যে। ১৮৮২ সালে জাম্বো চাকরি পায় সার্কাসে। সে আমলের বিখ্যাত আমেরিকান শোম্যান ছিলেন পি টি বারনাম। তাঁর সার্কাসে খেলা দেখিয়ে জাম্বো পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে যায়। এবং সেই সঙ্গে তার স্থায়ী জায়গা হয়ে যায় অভিধানে একটি বিশেষণ হিসেবে।

বাঃ বাঃ, মরিস বললেন। হাতির ছবি তুলতে এসে কি সুন্দর কাহিনী শোনালে ভাই! আচ্ছা ইতিহাসেও কি ওদের জায়গা আছে? থাকলে কত পুরনো?

স্টোভিল উত্তর দেওয়ার আগেই ক্যাম্পে ঢুকল কাবিলা আর বোলোঙ্গো। কাঁটাগাছ পোঁতা শেষ হতেই ওরা দেখেছে একটি হাতির দল গভীর বিস্ময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল ওদের এই তাঁবুটিকে।

পরজীবীর সংক্রমণ আটকাতে হাতিটি সারা শরীরে ধুলো মাখছে।

শুঁড়ের সাহায্যে ভোজনপর্ব চলছে।

তবে সাহেবদের ওরা জানাল এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। হাতিরা হরদম মানুষ দেখে। তাই মানুষ নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামায় না। খুব কাছাকাছি না গেলেই হলো। আর হ্যাঁ, কোনও হস্তিশাবককে দেখে তাকে আদর করতে যদি সাহেবদের হাত নিশপিশ করে তবেই ঘনিয়ে আসবে সাংঘাতিক বিপদ। হাতির দল দৌড়ে এসে ওদের সবাইকে দুরমুশ করে দিয়ে যাবে। মরিস বললেন, আমাদের আর চিন্তা কী? আমরা তো তোমাদের সঙ্গে যাব, তোমাদের সঙ্গেই থাকব সবসময়। বিপদ বুঝলে তোমরা সাবধান করে দেবে। এখন বরং এখানে বসো। শোনো তোমাদের অন্নদাতা হাতিদের নিয়ে নানা কথা আর নানা তথ্য। সাহেবদের কথায় খুব খুশি হলো এলিফ্যান্ট প্রজেক্টের ঐ দুই গাইড। বলল, আমরাও বলব আমরা যা জানি।

ক্যাম্পের খোলা অংশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে অরণ্য। লাল আলোর ঘেরাটোপে সবুজ গাছপালা, ঘাস আর গুল্ম কী অলৌকিক। একটা সোনালি ডানার ঈগল এরোপ্লেনের মতো উড়তে উড়তে এসে নামল সামনের বাওবাব গাছের ডালে।

স্টোভিল গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন, হ্যাঁ, ইতিহাসে ওদের নাম পাচ্ছি বইকি। নানা অধ্যায়ে নানা সময়ে ওরা এসেছে ইতিহাসের পাতায়। সর্বপ্রথম খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সালে। সে বছর পারস্যের সৈনিকরা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে আসে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে। জয় অবশ্য আলেকজান্ডারের হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২১৮ সালে হানিবল ইটালি আক্রমণ করতে আল্পস পর্বত পেরিয়েছিলেন তাঁর হস্তীবাহিনী নিয়ে। আর ভারতের রাজ-রাজড়ারা তো হাতির পিঠে ছাড়া চড়তেনই না। তা সে মৃগয়াতেই যান কিংবা যুদ্ধে। হাতি ছিল ওঁদের ক্ষমতার প্রতীক। এছাড়াও পোষমানা হাতিদের দিয়ে করানো হতো নানা ভারী কাজ। তবে দুর্ভাগ্য আফ্রিকার হাতিদের। ওদের মানুষ পোষ মানানোর চেষ্টা করেনি। ওরা শুধু হাজার হাজার বছর ধরে শিকার হয়েছে মানুষের লোভের। ওদের মাংস আর মহার্ঘ দাঁতের জন্য মানুষ প্রায় মুছেই ফেলছিল আফ্রিকার হাতিদের। আর সেক্ষেত্রে এইভাবেই ওরা বুঝি চলে আসতো ইতিহাসের পাতায়।

স্টোভিলের কথা শেষ হতেই কাবিলা বলল, এই সেদিনও মানে ১৯৭৯ সালে আফ্রিকায় হাতির সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ কিন্তু মাত্র ১১ বছর পর ১৯৯০ সালে সংখ্যাটা কমে ৬ লক্ষে দাঁড়ায়।

আর এ জন্য দায়ী জাপান। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল বোলোঙ্গো।

কেন? কেন? জাপানীরা কেন? মরিস জিগ্যেস করলেন।

হ্যাঁ ওরাই। ওদের জন্য বছরে ১২ হাজার হাতি মারা হতো। আমি সে সময় অর্থাভাবে পোচারের কাজ করেছি। দিনে রাতে অসংখ্য হাতিকে স্রেফ একটি বুলেটে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। বোলোঙ্গোকে খুবই বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। কাবিলা ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল, এখন তো তুমি ওদের সংরক্ষণের কাজে নেমেছো। তোমার মনে অনুতাপও এসেছে। এতেই আয়ু বাড়বে হাতির। তুমি বরং সাহেবদের জাপানীদের কথাটা শোনাও।

নিজেকে সামলে নিয়ে বোলোঙ্গো বলতে শুরু করে, জাপানের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হলো নিজেদের নাম বা দস্তখতের সীলমোহর তৈরি করা। যা কালি বা স্ট্যাম্প প্যাডে ডুবিয়ে কাগজে চেপে দিলেই ফুটে উঠবে ঐ নাম বা দস্তখত। ঐ সীলমোহর তৈরি হয় শুধুমাত্র হাতির দাঁত দিয়ে। শুধু সীলমোহর আর গয়না তৈরির জন্য পৃথিবীতে হাতির দাঁতের চাহিদা ব্যাপক।

এর মধ্যে ক্যাম্পের ভেতর জ্বলে উঠেছে ব্যাটারির আলো। বাইরে ঝিঁঝি আর নানা পোকামাকড়ের রাতব্যাপী জলসা। দূরে কোথাও চিতাবাঘ ডেকে উঠল। ভেসে এল হাতির প্রবল বৃংহণের শব্দ। মরিস ও স্টোভিল দৃষ্টি বিনিময় করলেন। এমন হুঙ্কারের সামনে ক্যামেরা ধরে দাঁড়ানো যাবে তো?

পরদিন খুব ভোরে পাওয়া গেল একটি হাতির দল। ওঁরা দুজন ছিলেন একটি খোলা জিপ গাড়িতে। কাবিলা আর বোলোঙ্গো সামনে পায়ে হেঁটে চলেছে। সকালের অরণ্যের সঙ্গে তুলনা হতে পারে শুধুমাত্র স্বর্গের। সবুজ বনানী যেন সবেমাত্র শিশিরে স্নান সেরে উঠেছে। শিশির-বিন্দুর ওপরে এসে পড়েছে ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মি। চতুর্দিকে সেই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এমন নরম মায়াময় আলোয় প্রথম যে হাতির দলটি ওঁরা দেখলেন, তারাও সেই আলো মেখে যেন রূপকথার দেশ থেকে সদ্য উঠে আসা।

কাবিলা ইঙ্গিত করতেই গাড়ি থেমে গেল। মরিসের শার্টার পড়তে থাকল।

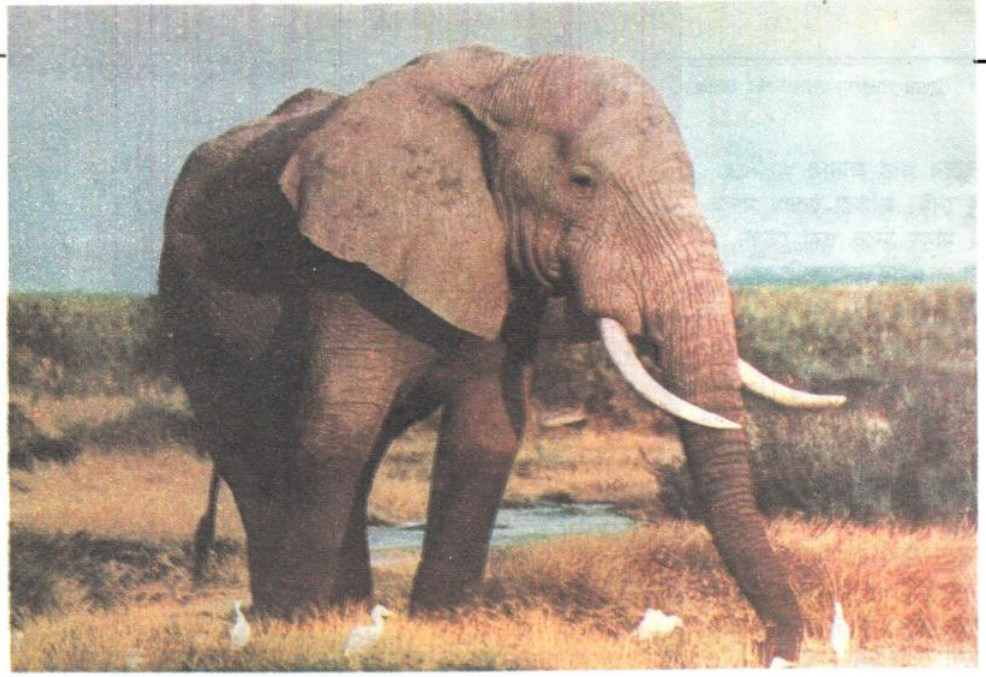

আফ্রিকার জঙ্গল জায়েন্ট।

সেই শব্দে দলের দু'তিনজন সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাল বটে তবে তা মুহূর্তের জন্য। ক্যামেরা দেখে ওরা শুঁড় ঘুরিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিরে গেল নিশ্চিন্তে।

বোলোঙ্গো বলল, এই দলটিতে মোট কুড়িটি হাতি আছে।

এদের মধ্যে দলপতি কে? মরিস জিগ্যেস করলেন।

দলপতি নয় দলনেত্রী। কাবিলা বলল, হাতিদের পরিবার হলো মাতৃতান্ত্রিক। এই যে দলটি দেখছেন এদের মধ্যে কয়েকটি পুরুষ হাতি আছে বটে তবে তারা নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য শিশু। পুরুষ হাতি বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছলেই এই দল ছেড়ে চলে যাবে। সেটা হয় ওদের বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সে পৌঁছলেই।

স্টোভিলরা ছবি তুলেই চলেছেন। মাঝে মাঝে ক্যামেরা থেকে চোখ তুলে দেখছিলেন হাতির দলটিকে। মহানন্দে তারা নিজেদের গায়ে জল আর ধুলো ছেটাতে ব্যস্ত। ধুলোর আস্তরণে তারা নিজেদের আচ্ছাদিত করে রাখে যাতে কোনোরকম পরজীবীর সংক্রমণ চামড়ায় না হয় তার জন্য।

স্টোভিল জিগ্যেস করলেন, এই যে দলটিকে আমরা দেখছি এরা কি চিরটা কাল এইভাবে কাটাবে নাকি দল ভেঙে আবার নতুন দল গড়বে?

কাবিলা বলল, ওরা সারা জীবন কাটাবে একই সঙ্গে। এমনটা চলে আসছে ওদের বংশপরম্পরায়। ঐ কটি হাতির আবার পরিচিত দল আছে। তারা আছে আশপাশেই। বিপদের সময় সব দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যায়। সে সময় আমরা এক একটি দলে ২০০-র মতো হাতিও দেখেছি। আর দলনেত্রী যে হস্তিনীটিকে আপনারা দেখছেন সে এখন প্রৌঢ়া। ওর প্রধান কাজ দলকে রক্ষা করা এবং কোনও হস্তিনীর বাচ্চা হলে তাকে সাহায্য করা তো বটেই বাচ্চাটিরও ভালোরকম দেখভাল করা। দলটির ভালোমন্দ সব কিছুর জন্য চিন্তাভাবনা দলনেত্রীর। খাবার কিংবা জলের সন্ধান, শত্রুর মোকাবিলা সব কাজ সে একাই সামলায়।

দেখতে বেশ লাগছিল। অত বড় হাতি এর আগে ওঁরা দেখেননি। দলটি যেখানে, সেখানে রয়েছে একটি বড়সড় জলাশয়। জলে নেমে যে তারা বিলক্ষণ আনন্দ পাচ্ছে তা তাদের আচার-আচরণে বোঝা যাচ্ছিল। একটু পরে দেখা গেল পরিষ্কার জল থেকে উঠে ওরা কাদাজল মাখতে লাগল সবাই মিলে। তারপর ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে থাকল। বোলোঙ্গো বলল, শুধু পোকামাকড়ই নয় দিনের প্রচণ্ড খরতাপ থেকে এই কাদা আর ধুলো ওদের রক্ষা করবে।

ওঁরা ঠিক করলেন এই হাতির দলটিকেই ওঁরা অনুসরণ করবেন। কিন্তু বাধ সাধল কাবিলা এবং বোলোঙ্গো। ওরা দুজনে বলল, ওদের ছেড়ে সামনে এগোনো বোধহয় ভালো হবে সাহেব। কেননা এরপর ওরা খাওয়া শুরু করলে তা চলতেই থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কতক্ষণ ধরে চলে ওদের সারাদিনের খাওয়ার পর্ব?

তা প্রায় ষোলো ঘণ্টা।

আচ্ছা পেটুক বটে। স্টোভিল বললেন।

কাবিলা বলল, শুধু পেটটাই দেখলেন স্যার? ওদের গতরটাও একবার দেখুন। জিরাফের পরই যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি লম্বা তা ঐ আফ্রিকার হাতি। আর আয়তনে ডাঙার প্রাণীদের মধ্যে ওরাই সর্ববৃহৎ। আফ্রিকার পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতির উচ্চতা ১১ ফিট পর্যন্ত হতে পারে। মেয়ে হাতিরা সেক্ষেত্রে হয় ৯ ফিট অবধি। আর ওজন? পুরুষ হাতিরা ৫,৪০০ কিলোগ্রাম এবং মেয়েরা ৩,৬০০ কিলোগ্রামের আশেপাশে থাকে সবসময়। এর মধ্যে ওদের দাঁতের ওজনটাও কিন্তু ধর্তব্যের মধ্যে।

পুরুষ এবং মেয়ে এই দু'ধরনের হাতিরই দাঁত আছে। পুরুষ হাতির একটি

দাঁত ৬ থেকে ৮ ফিট পর্যন্ত লম্বা এবং ওজন ২৩ থেকে ৪৫ কেজি অবধি হয়ে থাকে। আর মেয়ে হাতির বেলায় ঐ দাঁতের ওজন ৭ থেকে ৯ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়। এ পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে দীর্ঘ পুরুষ হাতির দাঁতের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে ১১ ফিট এবং ওজনে ১৩৩ কিলোগ্রাম।

মরিস এবার একটু চমকেই দিলেন সকলকে প্রশ্ন করে। জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা বল তো, পুরুষ হাতির একটি কানের ওজন কত? প্রশ্নটা শুনে দেখা গেল কাবিলা এবং বোলোঙ্গো দু'বন্ধুই কান চুলকোচ্ছে। একটু দূরে থাকা হাতিদের মস্ত কানের দিকে তাকিয়ে একটা আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন স্টোভিল। কিন্তু না। সকলেই পাঁচ-দশ কেজি অবধি বলেই স্বীকার করে নিল এটি কারোরই জানা নেই। মরিস ততক্ষণে গাড়িতে উঠেছেন। পেছন পেছন আর সবাই। ওঁদের পরবর্তী গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি ছাড়তেই মরিস বললেন, ৫০ কেজি, একটি পূর্ণবয়স্ক আফ্রিকার হাতির কানের ওজন। এটি আমি স্যানডিয়েগো জু-তে গিয়ে জেনেছি।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এল গাড়ি। রোদের তেজ বাড়ছে। কাবিলা মানুষটি বেশ রসিক। কঠিন দারিদ্র্য আর প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম ওর রসবোধকে নষ্ট করে দিতে পারেনি। এছাড়াও রয়েছে অরণ্যের প্রতি গভীর টান এবং এখানকার প্রতিটি প্রাণীর ওপর বুকভরা ভালবাসা। ও সাহেব দু'জনকে বলল, চলুন স্যার এবার আমরা ওদের ভোজসভাতে যাই। ওখানে আপনারা দেখতে পাবেন ওদের প্রিয় খাবার এবং খাওয়ার ধরন-ধারণ।

অরণ্যের যে অংশে গাড়িটি এখন ঢুকল সেটি বেশ ঘন এবং গভীর। গাছপালা এত নিবিড় যে শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। তা দেখে স্টোভিল বললেন, এই জন্যই প্রকৃতি হাতির সৃষ্টি করেছে।

হাতিরও প্রয়োজনীয়তা আছে তাহলে? এত বড় চেহারা নিয়ে ওরা কাদের কি উপকারে লাগে শুনি? মরিস

এই সেই জাম্বো।

একপাল ইম্পালার ছবি নিতে নিতে বললেন। স্টোভিল বললেন, সেই কথাতেই তো আসছি। খুব ঘন জঙ্গলে হাতি ঢুকে সেটিকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা করে দেয় গাছপালা খেয়ে। ফলে সে জঙ্গলে আরও অন্য প্রাণীরা আশ্রয় নিতে পারে। ওরা যখন এমন গভীর জঙ্গলে ঢোকে তখন ওদের চাপে গাছপালা নষ্ট হয়ে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন পথের। সে পথ ধরে হাঁটে হরিণ আর জেব্রা। ডিপ টিউবওয়েল যেমন মাটির নিচ থেকে জল তোলে অনেকটা সেরকমই হাতি শুকনো নদী খুঁড়ে খুঁড়ে অনেক গভীরে পর্যন্ত গিয়ে জল বার করে আনে। আর সে জল পান করে অসংখ্য প্রাণী। এর সঙ্গে এ কথাটাও জেনো আফ্রিকার হাতিরা দু'ভাগে বিভক্ত। 'বুশ এলিফ্যান্ট' আর 'ফরেস্ট এলিফ্যান্ট'।

গাড়ি থেকে নেমে ওঁরা হাঁটে যাচ্ছিলেন আলো-আঁধারি পথ ধরে দিনের বেলাতেও ঝিঁঝিরা কনসার্ট বাজাচ্ছে দল বেঁধে। পায়ের নিচের জমি এতই ভিজে যে মনে হচ্ছে একটু আগেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। বেশ খানিকটা এগোবার পর কাবিলা ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে সকলকে চুপ করতে বলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা কানে এল সকলের। অরণ্যের মধ্যে যেন জঙ্গল নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। ওঁরা সকলে গিয়ে একটি জলাধারের কাছে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন দশটি হাতির একটি দল আপন মনে গাছপালা ভাঙছে আর ইচ্ছে মতো খাচ্ছে। দু'একজন মস্ত দাঁত দিয়ে ফেড়ে ফেলছে গাছের গুঁড়ি তারপর মহা উৎসাহে গাছের ছালবাকল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই।

স্টোভিল বললেন, হাতি প্রচুর খায় বটে তবে ওদের হজম ক্ষমতা শরীর অনুপাতে যথেষ্ট নয়। যা খায় তার মাত্র চল্লিশ শতাংশ হজম হয়। বাকিটা মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ওরা খায় যা কিছু সবুজ। তবে গাছের ডালপালা, শিকড় কিংবা ছাল খেতেও আপত্তি নেই। বনের আশপাশে লোকালয় থাকলে সেখানে মুখ বদলাতে ঢুকে পড়ে। ক্ষেতের শস্য-শাকসব্জী থেকে শুরু করে ফল-পাকুড় সবের জন্যই ওরা মাইলের পর মাইল হাঁটতে রাজী।

কাবিলা বলল, ওদের তো সারা সময়ই হাঁটতে দেখি। ওদের হাঁটার গতিবেগ কত স্যার? স্টোভিল বললেন, দুলকি চালে আয়েশ করে যখন চলে তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার। যখন দূর পথে পাড়ি দেয়, তখন গতিবেগ বেড়ে হয় ঘণ্টাপিছু ১৬ কিলোমিটার। আর রেগেমেগে যখন তাড়া করে কারোকে তখন সে গতি ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। তবে বেশি সময় পর্যন্ত ওরা ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারের গতি বজায় রাখতে পারে না। আর একটা কথা। অত বড় চেহারা হলে কি হবে ওদের চলাফেরা প্রায় নিঃশব্দই বলা যায়।

ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন হাতিদের দল

থেকে অনেকটা দূরে। তবু হাতির দল লক্ষ করেছে ওঁদের। দলনেত্রী খাওয়া বন্ধ করে ভয়ঙ্কর শব্দ করল দু'বার। শব্দটা শোনাল অনেকটা যেন ডিজেল ইঞ্জিনের হুইসেলের মতো। স্টোভিল ছবি তুলেই যাচ্ছিলেন। হাতির বৃংহণে অবশ্য ওঁর হাত একটু কেঁপে গেল। কিন্তু অভয় দিল কাবিলা। বলল, ও কিচ্ছু না। দিদিভাই বলছে, খাওয়ার সময় তোমরা যেন গোল করো না ভালোমানুষের ছেলেরা।

তুমি বোঝ ওদের ভাষা? মরিস ক্যামেরার শার্টার টিপতে টিপতে জিগ্যেস করলেন।

না বুঝলে আর চাকরি থাকে কি করে? বোলোঙ্গো ফিসফিস করে বলল। আফ্রিকার হাতিরা পঁচিশ রকমের শব্দ করতে পারে এবং প্রতিটি শব্দের আলাদা অর্থ আছে। এই ক'টি শব্দের মাধ্যমে ওরা নিজেদের মধ্যে চমৎকার ভাবের আদান-প্রদান চালিয়ে যায়। শব্দ ছাড়াও শরীরের নানা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যেও ওরা ওদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে।

হাতির খাওয়ার ছবি তুলে ওঁরা চললেন আবার অন্য একটি দলের সন্ধানে। স্টোভিল আর মরিস বললেন, ওঁরা পুরুষ হাতির কোনো দলের ছবি তুলতে চান। গাড়ি আবার এগুতে লাগল অপেক্ষাকৃত কম জঙ্গলের দিকে।

হাতির শুঁড় নিয়ে কথা শুরু করলেন মরিস। বললেন, আমার খুব ইচ্ছে করে ওদের শুঁড়ে বসে জঙ্গলে ঘুরি আর ছবি তুলি।

সে চেষ্টা করতে পারেন তবে তার আগে হাতিকে পোষ মানাতে হবে, কাবিলা বলল।

আচ্ছা শুঁড়টা আসলে কী? হাতির নাক না হাতির হাত? ছেলেমানুষি প্রশ্ন মরিসের।

স্টোভিল বললেন, শুঁড় হলো হাতির নাক আর ওপরের ঠোঁটের একটি মিলিত ব্যাপার। শুঁড়ে কোনও হাড় নেই। সমস্তটাই পেশী যা কিনা ৫ ফিট অবধি লম্বা হতে পারে এবং এর ওজন কম-বেশি ১৪০ কিলোগ্রাম। হাতি কিন্তু শুঁড়ের সাহায্যে যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালায়, গন্ধ নেয় তেমন খাওয়া আর জলপানের সময়তেও এটি ব্যবহার করে। শুঁড়ের সাহায্যে জল তুলে চমৎকার স্নানও ওরা সেরে নেয় দিনে একবার করে। একটি বয়স্ক হাতির শুঁড়ে ৬ লিটার অবধি জল ধরে। এই শুঁড় আবার হাতির হাতও বটে। গাছের গুঁড়িও (২৭০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত) যেমন শুঁড়ের সাহায্যে বয়ে নেয় তেমনি ছোট্ট একটি মুদ্রাও কুড়িয়ে নিতে পারে হাতির শুঁড়। নিজেদের মধ্যে নানা ভাব আদান-প্রদানের সময় ওরা শুঁড় ব্যবহার করে। খেলার ছলে লড়াই হলে শুঁড়ে শুঁড়ে তা চলতে পারে তবে আসল লড়াইয়ের সময় দু'পক্ষই শুঁড় চিবুকের তলায় গুটিয়ে রাখে। খাবার খোঁজার সময় ওরা ঘন ঘন শুঁড় ওপরে তুলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে সন্ধান করে। একই ভাবে শত্রুর উপস্থিতিও জেনে নেয়।

ওদের শত্রু কে? জানতে চাইলেন মরিস।

কে আবার? আমরা, যারা মানুষ। বেশ ঝাঁঝ দেখিয়ে বলল বোলোঙ্গো। মানুষ ছাড়া হাতির ক্ষতি করতে পারে এমন প্রাণী ত্রিভুবনে নেই। একমাত্র বাচ্চা হাতির ওপর নজর থাকে সিংহ কিংবা চিতাবাঘের। বেকায়দায় পেয়ে গেলে তারা স্রেফ ছিনতাই করে নিয়ে যায় বাচ্চা হাতিটিকে। তবে এ সুযোগ ওরা কমই পায়।

ওদের আয়ু কত বোলোঙ্গো?

যদি না জলাভাব, রোগ-বালাই কিংবা চোরা-শিকারী তার মৃত্যুর কারণ হয় তবে পঁয়ষট্টি বছর। ওদের চিবোনোর যে পেষণ দন্ত তা ক্ষয়ে গেলেই ওরা আর খেতে পারে না। তখন পুষ্টির অভাবে ওরা মারা পড়ে।

আচ্ছা, এ কথাটি কী সত্যি যে মৃত্যু ঘনিয়ে এলেই ওরা আপনা-আপনি চলে যায় কোনও ফাঁকা জায়গায় তারপর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে?

হ্যাঁ, এটা প্রচলিত বিশ্বাস। তবে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো ওরা তখন জঙ্গলের এমন জায়গা বেছে নেয় যেখানে আছে ছায়া আর নরম উদ্ভিদ। ঠিক এমন জায়গাতেই হাতির হাড়গোড় পাওয়া যায় বহু যুগ ধরে। আর তাই এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে মৃত্যু আসন্ন বুঝলে হাতিরা নিজেরাই তাদের কবরখানায় চলে যায় হেঁটে হেঁটে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে গাড়ি চলছে আর থামছে। হাতির দলের আর পাত্তা নেই। কাবিলা একটু হেসে বলল, কি ব্যাপার, ব্যাটারা ইঁদুর-টিদুর দেখল নাকি যে ভয়ে সব লুকিয়ে আছে? স্টোভিল আর মরিস ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন কাবিলার দিকে। লোকটা বলে কী? হাতি কিনা ভয় খায় ইঁদুরকে?

হ্যাঁ সাহেব, ওরা দুজনেই বলল, আমাদের নিজেদের চোখে দেখা। ছোট ছোট ইঁদুর দেখলেই ওরা ভয় পায় এই বুঝি ওরা ওদের শুঁড়ে ঢুকে পড়বে। সত্যি সত্যি ঢুকে পড়লে সে এক দারুণ দৃশ্য। শুঁড় উঁচু করে সে কী হাঁচি আর নাক ঝাড়া শুরু হয় ওদের। জঙ্গলে ইঁদুর দেখলেই তাই ওরা জয়পতাকার মতো শুঁড়কে মাথার ওপরে তুলে হাঁটতে থাকে।

স্টোভিল বললেন, মরিস, দরকার হলে গোটা লাইফ থেকে যাব এ জঙ্গলে। এমন একটা শট যদি নিতে পারতাম! হাতির ইঁদুর ভীতি নিয়ে হাস্য-পরিহাস যখন বেশ জমে উঠেছে ঠিক তখনই ওঁদের পেছনে যুদ্ধের ভেরীর মতো বেজে উঠল বৃংহণ। ওঁরা সচকিত হয়ে পেছন ফিরতেই দেখেন কিলিমানজারো পাহাড়ের মতোই অতিকায় একটি দাঁতাল।

বোলোঙ্গো বলল, ঐ যে পুরুষ হাতি। ছবি তুলুন খুব সাবধানে।

ও কি ক্ষেপে আছে? জানতে চাইলেন স্টোভিল।

কাবিলা বলল, ও বলছে, যা করার তাড়াতাড়ি কর। আমার খুব খিদে পেয়েছে। এখন যাচ্ছি খাবারের সন্ধানে। হাতিদের তেমন ভয় করার দরকার নেই। ওরা বড়ই ভদ্র, বুদ্ধিমান এবং নিয়মনিষ্ঠ। আমরা তাই ভালোবেসে ওদের নাম দিয়েছি জেন্টল জায়েন্টস।

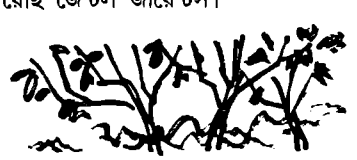

স্বপ্ন সফল হলো না এবারও

শা. প্রি. ব.

সুতরাং স্বপ্ন সফল হলো না। দীর্ঘ ১৫ বছর পরে বিদেশ থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে আসা সম্ভব হলো না সৌরভ বাহিনীর। প্রথম টেস্টে সহজে জেতার পর জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত হেরে গেল। এই হারের একমাত্র কারণ, দলনেতা সৌরভ গাঙ্গুলি সহ ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বেশিরভাগের জঘন্য ব্যাটিং। অথচ দ্বিতীয় টেস্টে খেলা কিন্তু একসময় ভারতের দিকেই ঢলে পড়েছিল। কিন্তু সেই সুযোগটা নিতে পারেননি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। বোলাররাও কিছু অংশে। জিম্বাবুয়ের প্রথম ইনিংসে তিনশর ওপর রান করার কোনো কারণ নেই।

জিম্বাবুয়ে যাবার আগে আমরা ভেবেছিলাম, ১৫ বছর পরে ভারত বিদেশ থেকে সিরিজ জিতে আসবে। ভারত শেষবার বিদেশের মাঠে রাবার জিতেছিল ১৯৮৬ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। সেবার ভারত ২-০ টেস্টে ইংলন্ডকে হারিয়েছিল। তারপর অবশ্য শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত ওদের দেশে গিয়ে রাবার জিতেছে। কিন্তু দুটি দেশই ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে। বিদেশে গিয়ে রাবার জিতে আসার আনন্দ ওদের বিরুদ্ধে ঠিক পাওয়া যায় না।

যাই হোক এই লেখা ছাপা হতে হতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ের ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাবে। একদিনের এই আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে ভারতীয় দলপতি সৌরভ গাঙ্গুলি যদি রান না পান তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বেন তিনি। কারণ জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টের তিনটি ইনিংসে তিনি করেছেন ৫, ৯ ও ০। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সৌরভের ব্যাটে তেমন রান ছিল না। দলনেতা ভালো খেললে তিনি সহজেই দলের খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করে তুলতে পারেন। না পারলে সেই ব্যর্থতার চাপ দলের অন্য খেলোয়াড়দের বিশেষ করে নতুন খেলোয়াড়দের ওপর পড়বেই। তাই শুধু নিজের জন্যেই নয়, ভারতের স্বার্থে সৌরভ গাঙ্গুলির এখনই ভালো খেলার দরকার। কারণ জিম্বাবুয়ে থেকে ফিরেই ভারত যাবে শ্রীলঙ্কায়। সেখানে ভারত, শ্রীলঙ্কা আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে হবে একদিনের ম্যাচের লড়াই। আর তার পরই ভারতীয় দল খেলতে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ভারতের সামনে এখন অনেক খেলা। তাই দরকার সৌরভের ব্যাটে রান আসার। টেস্ট ক্রিকেটে রানের হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। শচীন অবশ্য বরাবরই সবার ওপরে। তবে একদিনের ক্রিকেটে সৌরভ কিন্তু এখনো ওদের ওপরে। বিশ্বে দ্বিতীয় নম্বরে। এখন যদি তাঁর ব্যাটে রান না আসে তাহলে তিনি অনেক পিছিয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্ব পদ নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে।

সুনীল গাভাসকার, অরুণলাল, নবজ্যোৎ সিং সিধুরা বলছেন, সৌরভ বড় ব্যাটসম্যান। একটা ইনিংসে রান পেলেই ও আবার ফর্ম এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। কিন্তু কবে সৌরভ স্বচ্ছন্দ হবেন, কবে রান পাবেন? বেশি দেরি হলে কিন্তু তাঁরই বিপদ। রবি শাস্ত্রীরা বাছাবাছা তীর তৈরি করে রেখেছেন। আক্রমণ আসতে পারে যে কোনো সময়ে।

আমরা চাই, সৌরভ আবার রানের মধ্যে ফিরুন। তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসুক সেঞ্চুরি, হাফ সেঞ্চুরি। তাহলে জন রাইট নিশ্চিন্ত হবেন, নিশ্চিন্ত হবো আমরাও। জন রাইট চান না যে দলনেতার পদ থেকে সৌরভকে সরিয়ে দিয়ে দলের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে। আর যাই হোক, সৌরভের নেতৃত্বে ভারতীয় দল যে অন্য মেজাজে খেলছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিজে ব্যাট করতে না পেরে, শুধু দক্ষতার সঙ্গে দল পরিচালনা করে কী আর ক্যাপ্টেন থাকা যায়! তাই আমরা আশা করবো, সৌরভ ভালো খেলুন, তাঁর ব্যাটে রান আসুক।

বিদেশ থেকে সিরিজ জিতে আসা হলো না এবার। সামনে আরও বড় পরীক্ষা। খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। শ্রীলঙ্কার একদিনের ত্রিদেশীয় লড়াই-এর পর আমরা তাকিয়ে থাকবো সেই দিকেই।

রান ছিল না সৌরভের ব্যাটে—ট্রফি কিন্তু হাতে উঠেছে একটির পর একটি।

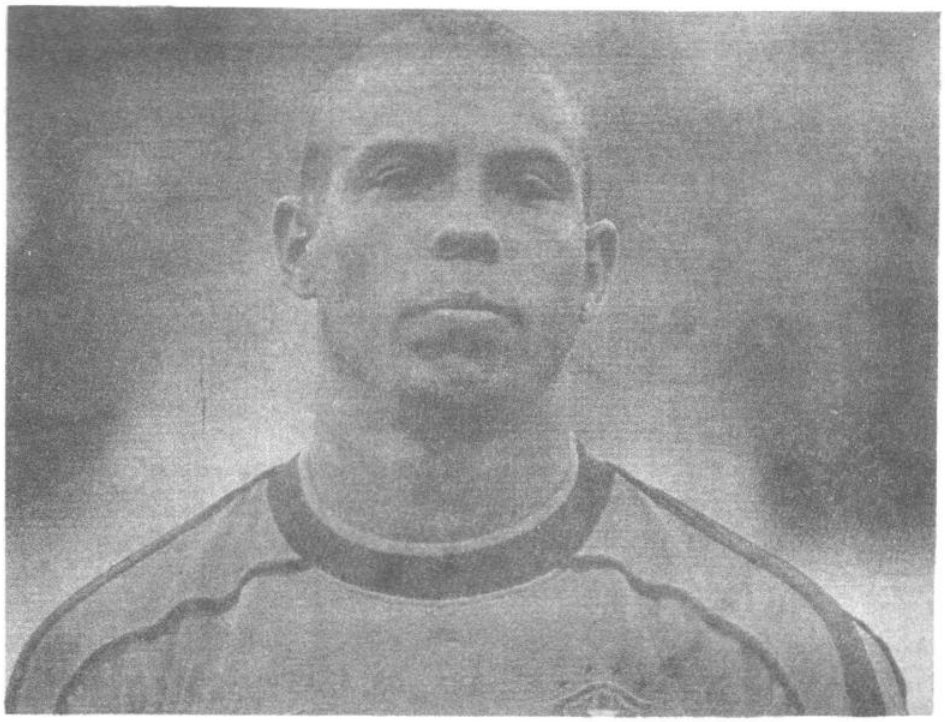

রোনাল্ডো।

ব্রাজিলের হলোটা কী?

ব্রাজিলের হলোটা কী! ক্রিকেট থেকে ক্যারিবিয়ানদের দাপট অনেকদিনই লোপাট হয়ে গেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন শুধু নামে কাটে, ভারে নয়। যতই কোর্টনি ওয়ালশ বিশ্বরেকর্ড গড়ুন, যতই ব্রায়ান লারা ঝলসে উঠুন, ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু তার কৌলিন্য হারিয়েছে। পেলের দেশ ব্রাজিলেরও সেই অবস্থা হতে চলেছে। কলকাতার ফুটবলের মান নামতে নামতে আজ যেমন তলানিতে পৌঁছেছে, যে সব কারণে কলকাতার ফুটবল আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, ঠিক সেই সব কারণই ব্রাজিলের ফুটবলকে অবক্ষয়ের শেষ ধাপে টেনে নামিয়ে এনেছে। সাম্বা নাচের যাদু আর ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের রক্তে ফুটবল-উন্মাদনা এনে দিতে পারছে না।

তার সব থেকে বড় প্রমাণ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বে ব্রাজিলের খেলাগুলো। ব্রাজিলের নামকরা খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই টাকার হাতছানিতে পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে। একসঙ্গে খেলার সুযোগ বা সুবিধে ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা ধরতে গেলে পান না। ফলে তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকেই যায়। এ ছাড়া ক্ষমতার লড়াই, ফুটবল রাজনীতি, পেলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদি তো লেগেই আছে। ফলে ফুটবল খেলার দিকে নজর দিতে পারছেন না কেউ। তারই নিট ফল প্রাক বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলের জঘন্য খেলা।

ওদিকে মাত্র এক বছর পরে ২০০২ সালের ৩১ মে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার খেলা হবে। প্রতিযোগিতার মূল পর্বে খেলার

ইস্টবেঙ্গলের বারপুজোর ছবিটি নবনালন্দার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী স্নেহা চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

মোহনবাগানের বারপুজোর মুহূর্তে। ছবি ঃ স্নেহা চট্টোপাধ্যায়।

যোগ্যতা যদি ব্রাজিল অর্জন করতে না পারে তাহলেও কিন্তু অবাক হবার কিছু থাকবে না। অথচ এই ব্রাজিলই ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে হেরে গিয়েছিল। মাত্র তিন বছর আগে যে দেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে হতে হতে পারেনি, সেই দেশই আজ বাছাই পর্বের খেলায় ধুঁকছে। বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলতে পারবে কিনা তাই নিয়ে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গবেষণা চলছে। অথচ এ পর্যন্ত সব থেকে বেশিবার বিশ্বকাপ জিতেছে তারাই। পেলের দেশের এই দুর্দশা সত্যিই অকল্পনীয়।

একই অবস্থা হয়েছে গ্যারি সোবার্স, ভিভ রিচার্ডসদের দেশের। ক্রিকেট খেলায় তারা আর পাত্তা পাচ্ছে না। যে কোনো দলের কাছে যে কোনো জায়গায় তারা হেরে যেতে পারে। ফুটবলে ব্রাজিলও একইভাবে হারাচ্ছে তাদের সুনাম। নষ্ট করে ফেলছে তাদের প্রতিপত্তি। জাপান-কোরিয়া যাবার টিকিট যদি তারা শেষ পর্যন্ত না পায় তাহলে আর যেই হোক আমরা কিন্তু খুশি হবো না। কারণ আমরা সব সময়ই কালো মানিকের দেশ ব্রাজিলের সাপোর্টার। ব্রাজিল ভালো খেলুক, আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর থেকে সুনাম কুড়িয়ে ফিরুক, তার জন্যে চাই খেলোয়াড়দের আলাদা আত্মবিশ্বাস আর লড়াকু মনোভাব। কোচ বদলে ব্রাজিল এখন সেই চেষ্টাই করছে। যদি কোনো কারণে ব্রাজিল জাপান-কোরিয়ার বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলতে যাবার টিকিট যোগাড় করতে না পারে তাহলে বিশ্বকাপের আগেই তা হবে মস্ত বড় অঘটন। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আকর্ষণও অনেক কমে যাবে।

এক নজরে

এবার শ্রীলঙ্কায়

জিম্বাবুয়ে থেকে ফিরেই ভারতীয় দল যাবে শ্রীলঙ্কায়। সেখানে হবে ভারত, শ্রীলঙ্কা আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ত্রিদেশীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। নিউজিল্যান্ড দলটি একদিনের ক্রিকেটে রীতিমতো শক্তিশালী দল। অনেক অঘটন ঘটিয়েছে তারা। শ্রীলঙ্কার শক্তি সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল। তাই মনে হয় ত্রিদেশীয় এই প্রতিযোগিতাটি জমবে খুব। এই প্রতিযোগিতার খেলার সূচী দেওয়া হল ঃ

রাহুল দ্রাবিড়ের ওপর সৌরভের বড় ভরসা।

লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি

১৮ জুলাই—শ্রীলঙ্কা : নিউজিল্যান্ড (দিন-রাত)

১৯ জুলাই—ভারত : নিউজিল্যান্ড (দিন-রাত)

২২ জুলাই—ভারত : শ্রীলঙ্কা (দিন-রাত)

২৫ জুলাই—শ্রীলঙ্কা : নিউজিল্যান্ড (দিন)

২৬ জুলাই—শ্রীলঙ্কা : ভারত (দিন)

২৭ জুলাই—ভারত : নিউজিল্যান্ড (দিন)

৩০ জুলাই—শ্রীলঙ্কা : নিউজিল্যান্ড (দিন)

২ আগস্ট—ভারত : শ্রীলঙ্কা (দিন)

৪ আগস্ট—ফাইনাল (দিন-রাত)

কার বলের কত জোর

কোন বোলার কত জোরে বল করেন তা জানার আগ্রহ সকলের। অনেক আগে এর সঠিক হিসেব পাওয়া যেত না। ১৯৬৪ সাল থেকে বলের গতি জানার যন্ত্র দিয়ে কে কত জোরে বল করছেন তা জানা যাচ্ছে। স্পিনাররা যতই দাপট দেখান না কেন, আসলে পেস বোলাররাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতাকে মাতিয়ে রাখেন। নিচে কোন বোলার কত জোরে বল করেন তার হিসেব দেওয়া হলো :

ফ্রেডি ট্রুম্যান (ইংলন্ড)—ঘণ্টায় ৯৩ মাইল

ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ইংলন্ড)—ঘণ্টায় ৮২ মাইল

জেফ টমসন (অস্ট্রেলিয়া)—ঘণ্টায় ৯৯.৮ মাইল

ডেনিস লিলি (অস্ট্রেলিয়া)—ঘণ্টায় ৯৬.২ মাইল

অ্যান্ডি রবার্টস (ওঃ ইন্ডিজ)—ঘণ্টায় ৯৭.৮ মাইল

মাইকেল হোল্ডিং (ওঃ ইন্ডিজ)—ঘণ্টায় ৯৫.২ মাইল

জন স্নো (ইংলন্ড)—ঘণ্টায় ৮৬.২ মাইল

ইমরান খান (পাকিস্তান)—ঘণ্টায় ৮৬.৭ মাইল

ওয়েস হল (ওঃ ইন্ডিজ)—ঘণ্টায় ৯২ মাইল

অ্যালান ডোনাল্ড (দঃ আফ্রিকা)—ঘণ্টায় ৯১.২ মাইল

ওয়াকার ইউনুস (পাকিস্তান)—ঘণ্টায় ৮৮.৫ মাইল

শোহেব আখতার (পাকিস্তান)—ঘণ্টায় ৯৩.৭ মাইল

গ্লেন ম্যাকগ্রাথ (অস্ট্রেলিয়া)—ঘণ্টায় ৮৮.৭ মাইল

জাভাগল শ্রীনাথ (ভারত)—ঘণ্টায় ৮৫.৯ মাইল

হিঙ্গিস ছুটছেন

মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে টেনিস কোর্ট থেকে সব থেকে বেশি রোজগার করেছেন স্টেফি গ্রাফ। তাঁর রোজগার মোট ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৭৭ ডলার। তারপরই আছেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ২

ভারতের হাল ধরতে সেই শচীনই।

দুই জাতীয় ফুটবলার—দীপেন্দু আর ফাল্গুনী।

কোটি ৪ লক্ষ ৫ হাজার ১৭৪ ডলার রোজগার করেছেন তিনি। আর দু' এক বছরের মধ্যে মার্টিনা হিঙ্গিস সম্ভবত এঁদের ছাড়িয়ে যাবেন। হিঙ্গিস এ পর্যন্ত টেনিস কোর্ট থেকে রোজগার করেছেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৭৭৬ ডলার। হিঙ্গিসের ঠিক পেছনেই আছেন অরান্থা ভিকারিও স্যানচেজ। এ পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৪০ ডলার। অরান্থা কতদূর এগোবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তবে হিঙ্গিস যে এখনো অনেকদিন খেলবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টেনিস কোর্ট থেকে তিনি আরও অনেক টাকা রোজগার করবেন। তাই মনে হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হিঙ্গিস ডিঙিয়ে যাবেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা আর তারপর স্টেফি গ্রাফের রোজগার। অবশ্য স্টেফি, মার্টিনা যখন খেলতেন তখনকার সময় থেকে এখনকার পুরস্কার-মূল্য অনেক বেশি, এ কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে।

স্পোর্টস কুইজ

(প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। তিনটি ভুল। একটি ঠিক। উত্তর ৪৬ পাতায়)

প্রশ্নঃ

১) কোন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে খেলেছেন?

টনি ব্লেয়ার	হ্যারল্ড উইলসন
আলেক ডগলাস হোম	উইন্সটন চার্চিল

২) এঁদের মধ্যে কে ন্যাটা বোলার নন?

বি এস বেদী	কর্সন ঘাউড়ি
রবি শাস্ত্রী	কপিলদেব

৩) প্রথম এশিয়াডে কোন দেশকে হারিয়ে ভারত ফুটবলে সোনা জিতেছিল?

ইরান	নেপাল
পাকিস্তান	চীন

৪) ১৯৯৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসের কোন বিভাগে অপর্ণা পোপাট রুপো জিতেছিলেন?

লংজাম্প	ট্রিপল জাম্প
ব্যাডমিন্টন	টেবল টেনিস

৫) পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ক্রিকেটার কে?

শচীন তেন্ডুলকার	সনথ জয়সূর্য
শ্যেন ওয়ার্ন	ওয়াসিম আক্রাম

৬) ভারতে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রথম সিরিজ কোন সালে খেলা হয়?

১৯৮০	১৯৮১
১৯৮২	১৯৮৩

৭) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেদিন খুন হন সেদিন ভারতীয় ক্রিকেট দল কোন দেশে খেলছিল?

অস্ট্রেলিয়া	ইংলন্ড
নিউজিল্যান্ড	পাকিস্তান

৮) কোন শহরে মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন?

রোম	মেকসিকো
বুদাপেস্ট	হিরোসিমা

৯) কার জন্মদিন ভারতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়?

ধ্যানচাঁদ	রণজিৎ সিংজী
মনসুর আলি পতৌদি	রূপ সিং

১০) কোন সালের ওলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করেছিলেন?

১৯২৮	১৯৩২
১৯৩৬	১৯৪০

এবার পুজোয়

বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নতুন গল্প, গোয়েন্দা গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, ভ্রমণ, হাসির গল্প, কল্পবিজ্ঞান, কবিতা, কার্টুন, ছড়া, নানা স্বাদের ফিচার ও কমিকসের সংকলন

এতে লিখেছেন ঃ

◎ অন্নদাশঙ্কর রায়
◎ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
◎ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
◎ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
◎ প্রফুল্ল রায়
◎ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
◎ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শুকতারা

◎ শৈলেন ঘোষ
◎ অনীশ দেব
◎ সঙ্কর্ষণ রায়
◎ চিত্তরঞ্জন মাইতি
◎ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
◎ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
◎ নারায়ণ সান্যাল
◎ রূপক চট্টরাজ
◎ নিরঞ্জন সিংহ
◎ মঞ্জিল সেন
◎ নটরাজন
◎ চণ্ডী লাহিড়ী
এবং আরও অনেকে

গাদাগুচ্ছে ছবিবহুল ও আকর্ষণীয় ফিচার

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১ ২২৪৩

উক্তি

সৌরভ গাঙ্গুলি বড় ব্যাটসম্যান। আজ রান পাচ্ছে না তো কী হয়েছে, কাল পাবে। এই মুহূর্তে ওর ব্যাটে রান নেই সেটা বড় করে না দেখে ও এতদিন কী খেলাটা খেলেছে সেইটাই তুলে ধরাটা উচিত নয় কি?

রাহুল দ্রাবিড়

(সৌরভ গাঙ্গুলির ব্যাটে রান নেই—সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে।)

বিদেশে গিয়ে আমরা জিততে পারি না—সে বদনাম তো এবার কিছুটা হলেও ঘুচেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে আমরা আরও ভালো খেলবো।

শচীন তেন্ডুলকার

(জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জেতার পর।)

জানতাম আমরা আবার জয়ের পথে ফিরে আসবো। এসেওছি। একটু সময় লাগল এই যা! এবার আমাদের লক্ষ্য উইম্বলডন। প্যারিসের জয়কে আমরা লন্ডনে টেনে নিয়ে যেতে চাই।

লিয়েন্ডার পেজ

ফরাসি টেনিস প্রতিযোগিতায় ডবলসে চ্যাম্পিয়ন হবার পর।)

সৌরভ গাঙ্গুলির ব্যাটিং-এর যে হাল দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, উনি দলের বোঝা হয়ে উঠবেন। ক্যাপ্টেন দলের বোঝা! ভাবাই যায় না।

রবি শাস্ত্রী

(টিভিতে কথা প্রসঙ্গে।)

জয় সব সময়ই আনন্দের। মনে রাখতে হবে, সহজে কিছু মেলে না। দলগত প্রচেষ্টার ফলেই জয়লাভ করা যায়। সে কৃতিত্বের অধিকারী দলের প্রত্যেকেই।

সৌরভ গাঙ্গুলি

(জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জেতার পর।)

অবসর গ্রহণ করেছি তো কী হয়েছে। দেশের যদি দরকার হয় আমাকে, প্রয়োজন যদি জরুরি হয় তাহলে ক্রিকেট মাঠে আবার ফিরে আসতেও পারি।

কোর্টনি ওয়ালশ

(ওয়ালশকে আবার দলে ফিরিয়ে আনার দাবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে।)

এবারের জাতীয় লীগে যে ক'জন বিদেশী খেলোয়াড় খেলেছে তাদের মধ্যে ব্যারেটোই শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ ফুটবল মস্তিষ্ক ছেলেটার। ওকে যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।

অমল দত্ত

(ব্যারেটোর কথা বলতে গিয়ে।)

আমার মনে হয় আরও কিছুদিন আমি দেশের হয়ে খেলতে পারতাম। কিন্তু ফর্ম থাকতে থাকতেই খেলা ছেড়ে দেওয়া ভালো। তাই সরে দাঁড়ালাম।

ইভান জামোরানো

(৩৪ বছর বয়স্ক চিলির খেলোয়াড়টি অবসর নেবার কথা বলতে গিয়ে এ কথা বলেছিলেন।)

জো পল আনচেরি যে কোনো দলের সম্পদ। ও এমন একজন খেলোয়াড় যে গোলরক্ষকের জায়গা ছাড়া যে কোনো পজিশনে খেলতে পারে। বিজয়নের সঙ্গে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দুর্দান্ত। এই জুটিকে কাজে লাগিয়ে আমি তো ভালো ফলই পেয়েছি।

সুখবিন্দার সিং

(ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে।)

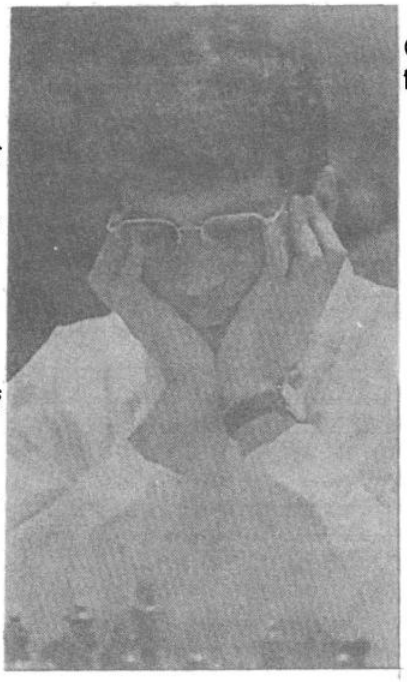

বিজয়ন আনন্দ: বিশ্ব দাবার চ্যাম্পিয়ন

উত্তর ঃ

(১) আলেক ডগলাস হোম
(২) কপিলদেব
(৩) ইরান
(৪) ব্যাডমিন্টন
(৫) শচীন তেন্ডুলকার
(৬) ১৯৮২
(৭) পাকিস্তান
(৮) রোম
(৯) ধ্যানচাঁদ
(১০) ১৯২৮

উঠছে যারা

বীরু বসু

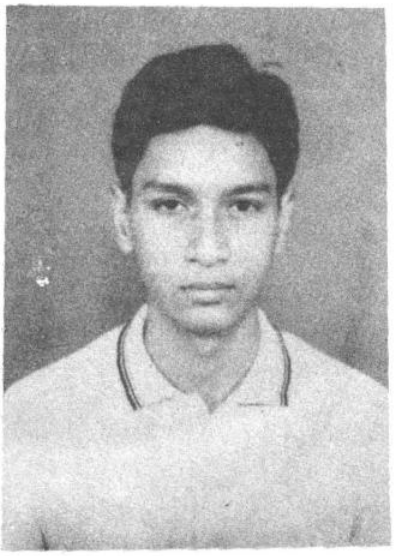

পিয়াল দাস

কোন্নগর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র পিয়াল দাস। পড়াশুনায় ভীষণ ভাল। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চারটি লেটারসহ পাশ করেছে। গণিতে ৯২, জীবন বিজ্ঞানে ৮৪, ভৌত বিজ্ঞানে ৮৫ এবং ওয়ার্ক এডুকেশনে সে ৮৭ নম্বর পেয়েছে। ফলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার পাত্রর লক্ষ্য এখন পিয়ালের দিকে। আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পিয়াল চাইছে উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের মান রাখতে।

এখন প্রশ্ন হলো লেখাপড়ায় যে ছেলেটি এত ভাল, খেলাধুলো করতে সে সময় পায় কি করে? এক্ষেত্রে অবশ্য পিয়াল নিজেই জানিয়েছে বাবা-মা'র উৎসাহটাই সে কাজে লাগিয়েছে। বাবা প্রদোষ দাস খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত, খেলতেন ফুটবল। পরে ব্যাডমিন্টনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যান। বর্তমানে হুগলি জেলা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক। রাজ্য ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য। সুতরাং যে মানুষটির রক্তে রয়েছে খেলাধুলোর নেশা, তাঁর ছেলেও যে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।

দশ বছর বয়সে পিয়ালের খেলাধুলো শুরু। ব্যাডমিন্টনে, পাড়ার বাদামতলা ক্লাবে ওর হাতেখড়ি। পরে অবশ্য কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে প্রশিক্ষক সুভাষ দে এবং মনোজ গুহর কাছে খেলাটা শিখে নেয়। প্রথম কয়েক বছর ছেলেটির ধ্যানজ্ঞান ব্যাডমিন্টন হলেও সাফল্য খুব একটা আসেনি। পরে বেশ কিছু কোচের সান্নিধ্যে এসে পিয়াল রাজ্য ব্যাডমিন্টন কর্তাদের নজরে আসে। বারো বছর বয়সে প্রথম রাজ্য মিটে অংশ নেয় কলকাতার লেক গার্ডেন্সে মিনি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায়। সাফল্য হয়তো পায়নি কিন্তু রাজ্য ব্যাডমিন্টনের দুই সেরা খেলোয়াড় সম্রাট অধিকারী এবং জিষ্ণু সান্যালের বিপক্ষে খেলে নজর কেড়েছে। অনূর্ধ্ব ১৪ রাজ্য স্কুল ব্যাডমিন্টনে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল পিয়াল। সেদিন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কোচ সুদর্শন বসু পিয়ালের উদ্দেশে একটা কথাই বলেছিলেন, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ধরে রাখতে পারলে তুমি বড় হবে। পিয়াল অবশ্য স্বীকার করেছে, ব্যাডমিন্টন খেলে কতটা বড় হব জানি না। তবে প্রশিক্ষক হিসেবে সুদর্শন স্যারের প্রেরণা আমাকে ব্যাডমিন্টন খেলাটাকে ভালবাসতে সাহায্য করেছে। সে কারণেই পিয়াল এখন রাজ্যসহ জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিচ্ছে। বাবা হুগলি জেলা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হলেও পিয়ালের ভবিষ্যৎ কিন্তু নির্ভর করছে লিলুয়া রেলওয়ে ইনস্টিটিউশনের ওপর কারণ সাফল্য পেতে গেলে যে স্তরের অনুশীলন প্রয়োজন, হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে থেকে পিয়াল তেমন কোন উন্নতমানের প্রশিক্ষণ সেখানে পায় না ফলে প্রশিক্ষণ নিতেই পিয়ালকে প্রতিদিন আসতে হয় লিলুয়াতে। কোচ হিসাবে অনাদি সেন এবং সত্যেন ঘোষ এখন পিয়ালকে বড় হবার পথ দেখাচ্ছেন। গত বছরে কলকাতার সাইয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে অংশ নিয়েছিল পিয়াল। সাফল্য অবশ্য পায়নি তবে গুজরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল মিটে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিল। সে কারণেই পিয়াল ভাবছে পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোতে লেগে থাকতে পারলে সাফল্য সে একদিন পাবেই।

এই মুহূর্তে ব্যাডমিন্টন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মা মমতা দাসের লক্ষ্য কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। মা চাইছেন খেলাধুলো সবই করুক, আগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তবেই প্রমাণ হবে খেলাধুলো ও লেখাপড়া একে অপরের পরিপূরক। পিয়ালের লক্ষ্যও সেটাই। কারণ লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা করার ইচ্ছে রয়েছে তার। ফুটবলপ্রিয় এই ছেলেটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গোঁড়া সমর্থক। জাতীয় লীগে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে সে খুশি। পাশাপাশি ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা হলেও পিয়াল মনে করে খেলাটাকে নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ফলে ফুটবলের মান কমছে। এমনভাবে চলতে থাকলে কলকাতার ফুটবল তার জৌলুস হারাবে। সেদিন হয়তো বাংলা থেকে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নামটাই মুছে যাবে।

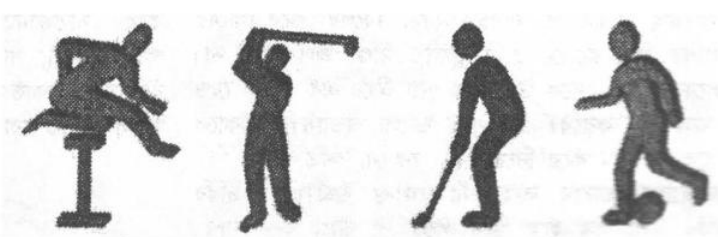

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

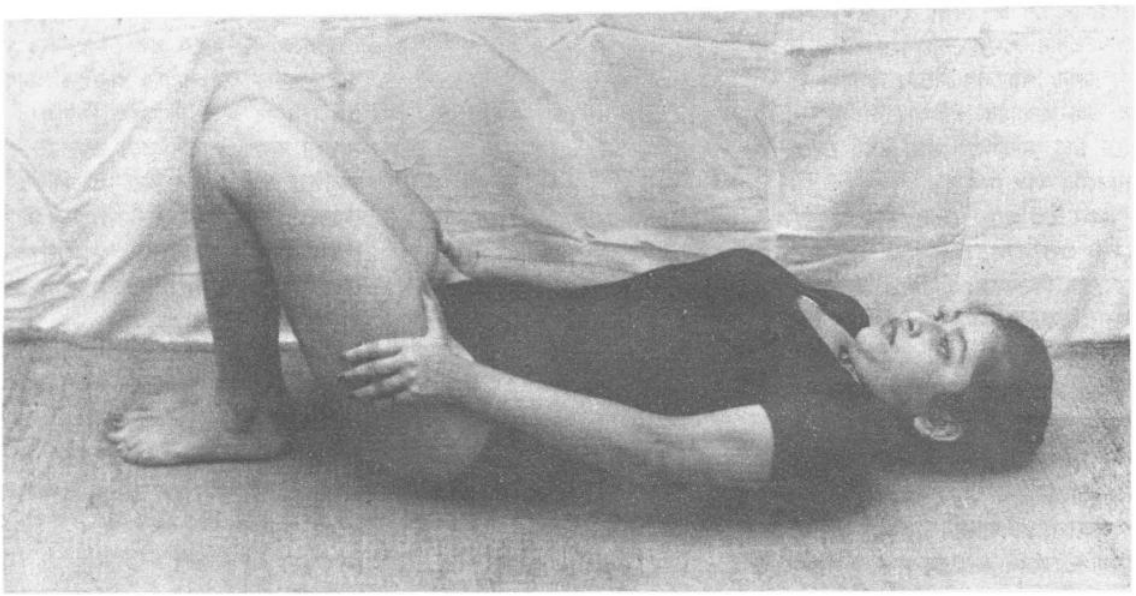

ব্যায়াম করার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কিছু নিয়ম পালন করা উচিত। এতে শরীর-স্বাস্থ্য দুই-ই ভালো থাকে। এখন তো আমের সময়। তোমরা যারা আম খেতে ভালোবাস নিশ্চয়ই আম খাবে। তবে আগে থেকে আম জলে ভিজিয়ে রেখে খেলে ভালো হয়। খুব ভালো একটি সুষম ফল আম। যারা শরীরের ওজন বাড়াতে চাও, আম তাদের খুবই সাহায্য করবে। সঙ্গে অন্যান্য মরশুমী ফল যখন যা পাবে খাবে। কোষ্ঠবদ্ধতা কাটাতে ফল ভালোরকম সাহায্য করে। জল সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করবে। গ্রীষ্মকালে শরীরে জলের চাহিদা অন্য সময়ের থেকে বেড়ে যায় তাই ওই সময় তিন লিটার জল অবশ্যই গ্রহণের চেষ্টা করবে। প্রচণ্ড রোদ থেকে এসেই সঙ্গে সঙ্গে জল খাবে না, একটু বিশ্রাম নিয়ে জল খেও। ফ্রিজের বা খুব ঠাণ্ডা জল না খাওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, বিশেষ করে যাদের সর্দিকাশির ধাত রয়েছে তারা ভুলেও ঠাণ্ডা জল খাবে না। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে নিয়ে এক থেকে দেড় গ্লাস জল পান করবে। এটি খুবই ভালো অভ্যাস। শীতকালে জল হালকা গরম করে নিয়ে খেলে কোনো ক্ষতি নেই।

আজকের ব্যায়াম লাইং নী ফোল্ড উড্ডীয়ান। ছবির মেয়েটির ন্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে পা ভাঁজ করে নাও। দু'হাতের তালু দু'পায়ের উরুর ওপর রাখ যেমনটি রেখেছে ছবির মেয়েটি। এখন ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণ শ্বাস ছেড়ে দাও নাক-মুখ দিয়ে এবং তলপেট যতটা পারবে ভেতর দিকে টেনে নাও। মনে মনে চিন্তা করবে নাভি যেন শিরদাঁড়াকে স্পর্শ করেছে। পাঁচ-দশ সেকেন্ড এভাবে দমবন্ধ করে থেকে ধীরে ধীরে পেট শিথিল করে দাও ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া-ছাড়া কর আট-দশবার। একইভাবে দু'বার এই ক্রিয়াটি কর। পরে বিশ্রাম নাও। আরও ভালো হবে শ্বাস ছেড়ে তলপেট টানার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতের তালু দিয়ে পায়ের উরুতে চাপ দিলে এবং হাতের তালুর স্থান পরিবর্তন না করে কনুই সোজা করার চেষ্টা করলে। দু'বার ক্রিয়াটি করে একবার বিশ্রাম নেবে—এইভাবে দু' থেকে তিনবার অভ্যাস কর।

শিরদাঁড়াকে লম্বালম্বি বাড়াতে এই ব্যায়ামটি খুবই সাহায্য করে। বাতজনিত কোমরের ব্যথা বিশেষ করে লাম্বার স্পন্ডিলোসিস, সায়াটিকা ইত্যাদি ব্যথাবেদনা দূর করবে এই ব্যায়ামটি। কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, পেটের অতিরিক্ত বায়ু, অম্বল প্রভৃতি রোগ দূর করতে খুবই সাহায্য করে।

আদর্শের উত্তরাধিকারী

সৌরভ কুমার ভূঞ্যা

নীলাদ্রি ভট্টাচার্য স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

ঘরের সুইচ অফ করে চুপচাপ বসেছিলেন রণজয়বাবু। চায়ের কাপ হাতে স্ত্রী শান্তিদেবী ঘরে ঢোকেন। সুইচ অন করে স্বামীকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখে বলেন, 'কী ব্যাপার, এমন করে বসে আছো কেন?'

'নাঃ, এমনি।'

'এমনি এমনি কেউ এভাবে বসে থাকে? আমি জানি, তুমি টাকার কথা ভাবছ।'

'হ্যাঁ শান্তি, তুমি ঠিক ধরেছ। মেয়েকে সারিয়ে তুলতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা লোন করেছি। মাসের শেষে যে বেতন পাবো, তার বেশির ভাগই চলে যাবে লোন শোধ করতে। বাকি টাকায় সংসার চালানো, কিভাবে যে কী হবে ভেবে পাচ্ছি না।'

'অত ভেবো না, উপায় একটা ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিভাবে হবে বল তো?'

'দেখ, আমি বলছিলাম কি, শিক্ষক হিসাবে তো তোমার যথেষ্ট নাম, ছাত্ররাও তোমার কাছে পড়ার জন্য জোর-জবরদস্তি করে। তুমি তো টিউশান পড়াতে পারো। তাতে যা আয় হবে আমাদের সংসার ভালোভাবে চলে যাবে।'

'দেখ শান্তি, তোমায় আমি আগেও বলেছি, প্রাইভেটে ছাত্র পড়িয়ে আমি পয়সা নিতে পারব না। ছাত্র পড়ানোর জন্য সরকার আমাকে প্রতিমাসে বেতন দেয়। এরপরও যদি পয়সা নিয়ে ছাত্র পড়াই সেটা অধর্ম হবে।'

'কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষকরা তো পড়ান।'

'কে পড়াল তা আমি জানতে চাই না। আমি আমার আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। স্কুলে আমি ছাত্রদের যত্নসহকারে পড়াই। তারপরও যদি কারো বুঝতে অসুবিধা থাকে এবং সে যদি আমার কাছে আসে তাহলে তাকে বুঝিয়ে দেওয়াটা আমার কর্তব্য। কিন্তু তার বিনিময়ে যদি পয়সা নিই, তাহলে সেটা আর পড়ানো থাকে না, ব্যবসায় পরিণত হয়। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। আমরা যদি আমাদের বিদ্যাকে নিয়ে ব্যবসা করি তাহলে ছাত্রদের কি শিখিয়ে যাব!'

'কিন্তু এভাবে চললে তো আমাদের একদিন না খেয়ে মরতে হবে।'

'শান্তি, আমি লড়াই করে বাঁচতে শিখেছি, তেমনি লড়াই করে বাঁচব। আশা করি ভাত-কাপড়ের অভাব আমাদের হবে না।'

শান্তিদেবী আর কিছু বলেন না, নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। বেশ কিছুদিন পর একদিন রণজয়বাবু বাড়ি ফিরছেন স্কুল থেকে, হঠাৎ একটি বছর ত্রিশ-বত্রিশের ছেলে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, 'স্যার ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ বাবা, কিন্তু তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'স্যার, আমি রফিক। ক্লাসে দ্বিতীয় হতাম। যখনই কিছু বুঝতে

পারতাম না, ছুটে যেতাম আপনার বাড়ি। আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। কতদিনই না গেছি। কাকীমার হাতের রান্না খেয়েছি, ভাইবোনের সঙ্গে গল্প করেছি।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, রফিক। মনে পড়েছে, কতবারই গেছো তুমি। তা এখন কী করছ?'

'একটা কোম্পানিতে কাজ করছি স্যার কিন্তু আপনাকে দেখে তো খুব ভালো মনে হচ্ছে না। বাড়ির সবার খবর কী?'

'সবাই মোটামুটি ভালো। ছেলেটা এবারে বি.এ. পাশ করেছে। মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় এইচ. এস. দিতে পারেনি এ বছর। পরের বছর দেবে। তা এসেছ যখন একবার ঘুরে যেও আমাদের বাড়ি। তোমার কাকীমা খুশি হবেন।'

'যাবো স্যার, অবশ্যই যাবো।'

এরপর যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু রফিকের মনে একটা খটকা বিঁধে থাকে। স্যার যেন কিছু লুকোচ্ছেন বাড়ি এসে সে বাবার কাছে চলে যায়। তার বাবা, রণজয়বাবুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দু'বছর হলো অবসর নিয়েছেন

বাবাকে জিজ্ঞেস করে রণজয়বাবু সম্পর্কে সে সবকিছু জানতে পারে। বাবা সবশেষে বলেন, 'জানিস তো মানুষটা একটু অন্য ধরনের। এমন আদর্শবাদী শিক্ষক আমার জীবনে আমি আর দেখিনি। সিনিয়র হলেও, আমি সব সময় ওঁর আদর্শের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। সংসারে এত অভাব তবুও আদর্শচ্যুত হননি। তুই একবার যাস ওঁর বাড়ি। খুব খুশি হবেন।'

বাবার কাছ থেকে উঠে আসে রফিক। সাতদিন পর সে যায় রণজয়বাবুর বাড়ি। শান্তিদেবী এতদিন পর রফিককে পেয়ে খুব খুশি হন। না খাইয়ে তাকে ছাড়েন না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে রফিক বলে, 'স্যার, এবার আমার একটা কথা আছে', বলে সে একটি খাম এগিয়ে দেয় রণজয়বাবুর দিকে। 'এটা পড়ুন স্যার।'

খাম খুলে কাগজটা পড়ে রণজয়বাবু অবাক। 'এ যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, আমার ছেলের জন্য, কিন্তু আমার ছেলে তো...'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রফিক বলে, 'স্যার, আমাদের কোম্পানিতে একটা পোস্ট খালি আছে। ঐ পোস্টটির জন্য আমার হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে। আমি আমার পছন্দমতো ব্যক্তিকে ঐ আসনে বসাতে পারি।'

'কিন্তু রফিক, এটা সম্ভব নয়। তোমাকে আমি একসময় পড়িয়েছি ঠিকই, তা বলে তার প্রতিদানে আমি যদি কিছু নিই সেটা ঠিক হবে না।'

'স্যার আপনার কাছে যা পেয়েছি, তার প্রতিদানে কিছু দেওয়ার মতো স্পর্ধা যেন আমার না হয়, আপনি সেই আশীর্বাদ আমায় করুন। পড়ার বাইরেও যে শিক্ষা আপনার কাছ থেকে পেয়েছি তার বিনিময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে গেলে আপনাকে ছোট করা হবে। আমি আপনার বাড়িতে এসেছি, কাকীমার হাতে খেয়েছি, তাঁর আদর পেয়েছি। খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গিয়েছিলেন। তাই মায়ের আদর পেতে বারে বারে ছুটে আসতাম। বঞ্চিতও হইনি কোনোদিন। পর না ভেবে সেদিনের মতো আপনারা যদি আমায় নিজের ছেলে মনে করে কাছে টেনে নেন তাহলে আমার ভায়ের জন্য কিছু করার অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি।'

একথার পর আর বোধহয় কিছু বলার থাকে না। রণজয়বাবুও কিছু বলতে পারেন না। রফিককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ গলায় বলেন, 'না রফিক, তোমার কাজে আমি আর বাধা দেব না, তাতে যদি আমায় আদর্শচ্যুত হতে হয় তবুও। কেননা, একজন শিক্ষকের জীবনের সার্থকতাই হচ্ছে আদর্শ ছাত্র তৈরি করা। তোমার মধ্যে আমি আজ সেই সম্পদ লক্ষ্য করেছি।'

রফিক স্যারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বলে, 'আশীর্বাদ করুন স্যার, আমি যেন আপনার মতো হতে পারি। কোনো অবস্থাতেই যেন আদর্শ থেকে সরে না আসি।'

নীলাদ্রি ভট্টাচার্য স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

স্বীকারোক্তি

অঞ্জনা রায়

বাড়ি থেকে বের হওয়ার মুহূর্তেই বুদ্ধিটা মাথার মধ্যে খেলে গেল অনিন্দ্যর। বেশ ভালো তো! করে দেখলে মন্দ হয় না। কিন্তু...। অত কিন্তু করলে হবে না। এই অফিস টাইমে মাঝপথ থেকে ঐ বাসটাতে ওঠা যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা মা জানবে কি করে! অথচ তাঁর নির্দেশেই অনিন্দ্যকে এখন দিদির বাড়ি হাওড়ায় যেতে হবে। আরও সকালে বেরলে ঐ ঝুলে ঝুলে যাবার ব্যাপারটা এড়ানো যেত কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তৈরি হতে হতে অনিন্দ্যর প্রায়ই এইরকম হয়।

কিন্তুটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অনিন্দ্য আবার বাড়ির ভিতর ঢুকে যায় কি যেন আনতে।

যা ভেবেছিল বাসের ছবিটা প্রায় তাই-ই। লোক না ঝুললেও বাসটা একেবারে ঠাসা। অন্য বাসে যাওয়া যায় কিন্তু লাল রঙের এই L7A-টাই অনিন্দ্যর প্রিয়। কী স্পিডে যায় বাসটা। যেন নবাবের ঘোড়া। কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে ছুটে চলেছে।

সাধারণত নতুন পাড়ার পরের স্টপেজে সরকারী বাসগুলো দাঁড়ায় না কিন্তু অনিন্দ্য হাত তুলতেই দাঁড়াল।

অনিন্দ্য দরজার দিকে এগিয়ে গেলে কন্ডাক্টর তাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে 'হ্যান্ডিক্যাপড সিট'-এর দিকে এগিয়ে দেয়।

ওখানে দজন বসেছিল। একজন উঠে ওকে বসিয়ে দেয়। অনিন্দ্যর চোখে কালো চশমা, হাতে স্টিক। অন্ধ মানুষদের মতো।

ওরকম সুন্দর, স্মার্ট কিশোরের দৃষ্টি নেই দেখে অনেকেই সহানুভূতির চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছিল।

পাশের ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন, যদি কিছু মনে না করো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

মনে মনে আঁতকে উঠলেও যথাসম্ভব নির্বিকার ভাব বজায় রেখে উত্তর দেয় অনিন্দ্য, না, না, মনে করবো কেন? জিজ্ঞেস করুন।

একটু ইতস্তত করেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, জন্ম থেকেই কি তোমার এরকম অবস্থা?

না...মানে একটা অ্যাকসিডেন্টে...আগে থেকেই এরকম ভেবে রেখেছিল অনিন্দ্য।

ওঃ বুঝেছি। কি করবে বলো। সবই অদৃষ্ট। কখন যে কার ভাগ্যে কি ঘটে যায় বলা যায় না। আহারে! এই বয়সে...ভদ্রলোক অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করলেন।

অনিন্দ্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ভিতরের কাঁপুনি থামানোর।

বাসটা দুরন্তগতিতে চলেছে। প্রতিবন্ধীর সিটে অনিন্দ্য। কিছুটা আশ্বস্ত হলেও মনের মধ্যে উদ্বিগ্ন ভাবটা রয়ে গেছে। কাজটা কি ঠিক হলো? পাশের লোকটা কিছু বুঝতে পারেনি তো? বোধহয় না। তাহলে তো...

তারাতলা থেকে দুজন লোক উঠল যাদের দেখামাত্রই অনিন্দ্যর পিলে চমকে গেল। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ। এবার বুঝি আর রক্ষে নেই। এক্ষুণি বাসসুদ্ধু লোক তাকে পিটিয়ে পরোটা করে দেবে। উফ্! ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে অনিন্দ্য।

পাশে বসা লোকটা উঠে যাচ্ছে টের পেয়ে চোখ খুলল। আরে, সে তো কালো চশমা পরে আছে। বাসের লোক বুঝবে কি করে! লোকটা উঠে গেলে সেই দুজনের একজন অনিন্দ্যর পাশে বসে পড়ে। লোকটির ডানহাত কাটা। আরেকজন অন্ধ। অন্ধ-সাজা অনিন্দ্য বসে আছে বলে দ্বিতীয়জন আর বসার জায়গা পায়নি। অনিন্দ্য কেঁপে উঠল কিন্তু প্রবল ইচ্ছেতেও উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিতে পারল না।

পাশে বসেই হাত-কাটা লোকটি বলল, তুমি কি জন্মান্ধ?

একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার শুনে ভীষণ চমকে উঠে সিট ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠছিল অনিন্দ্য। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়। আমতা আমতা করে আগের উত্তরটাই দেয়।

উত্তর শুনে প্রতিবন্ধী লোকটি প্রায় সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলে, কি আশ্চর্য দেখ, আমাদেরও অনেকটা ওরকম ঘটেছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে লরির ধাক্কায় আমরা দু'ভাই দু'দিকে ছিটকে গিয়ে একজন হলাম নুলো, আরেকজন অন্ধ।

মুহূর্তে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল অনিন্দ্যর মুখ। এ যে তারই বানানো গল্প! একটা হিম স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। কালো চশমার ভিতর দিয়ে সিটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধ লোকটির দিকে আড়চোখে তাকাল। লোকটি বাসের ঝাঁকুনিতে এর-ওর গায়ে হেলে পড়ছে। খুব অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই। আতঙ্কে, উত্তেজনায় অনিন্দ্যর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি ধরা পড়ে গেল।

লোকটির কথা তখনো শেষ হয়নি, জান, আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে বাবা-মায়ের কত স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাই বলে তাঁদের কষ্টের কারণ হয়ে থাকতে চাই না আমরা। কারো করুণাভিক্ষাও আমাদের প্রয়োজন নেই। তাই তো শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা দুজনেই বি. এসসি. পাশ করে একটা রিসার্চ সেন্টারে কাজ করছি। আর এসবই আমার মায়ের জন্যে হয়েছে। মা সবসময় আমাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, সৎ কাজ করার সদিচ্ছা থাকলে সব প্রতিবন্ধকতা অনায়াসে পেরনো যায়। আমাদের মা-ই আমাদের আদর্শ। শেষের কথাগুলো বেশ আবেগের সঙ্গে বলল।

কিন্তু একী! অনিন্দ্যর ভিতরটা এত ছটফট করছে কেন? কে তাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে? ঐ লোকটা? লোকটার কথাগুলো? না, অনিন্দ্যর বিবেক ওকে ভীষণ ভাবে দংশন করছে। যন্ত্রণায় নীল করে দিচ্ছে। এক ভদ্রঘরের সন্তান হয়ে সে এই বাজে কাজটা কি করে করতে পারল? তারও তো জীবনাদর্শ তার মা, মায়ের কথা। মাও তো ঠিক এই কথাগুলোই বলেন। মায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তো সে ঠিক করেছে, বড় হয়ে ডাক্তার হবে। অসুস্থ মানুষের সেবা করবে। তাহলে? তাহলে কি ও নিজেই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে? প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে?

সত্যিই কি অনিন্দ্য অন্ধ হয়ে গেছে? তা নাহলে কিছুতেই কেন চোখের সামনে থেকে কালো রঙের কাচের পর্দাটাকে সরাতে পারছে না! উফ্, কী কষ্ট!

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই
ছাত্রছাত্রীরা লুফে নিয়েছে

বাংলায় লাখ কথার এক কথা হল বাগ্‌বিধি বা প্রবাদ-প্রবচন। বাচ্য অর্থকে ছাড়িয়ে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনাকে তা অতিক্রম করে অর্থে আনে আশ্চর্য চারুতা। তাই বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ, বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ভাষার আত্মা। পরীক্ষার্থীর পাঠসূচিতেও এই বাগ্‌ধারা অন্তর্ভুক্ত...

কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ পাঠকও এই বইটি ব্যবহারে উপকৃত হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্রছাত্রীরা তো উপকৃত হবেই, বইটি সাধারণ পাঠকের কাছেও সমাদৃত হবে।

জ্যোতিভূষণ চাকী

বাগ্‌ধারা সংগ্রহ ২০

সংকলন ও সম্পাদনা : শৈলেন চক্রবর্তী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

অনিন্দ্য চিৎকার করে ওঠে, মা, মাগো...

কি হলো ভাই, শরীর খারাপ লাগছে? প্রতিবন্ধী লোকটিই জিজ্ঞেস করল।

ব্রেক কষে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল। হাওড়া এসে গেছে। প্যাসেঞ্জাররা আস্তে আস্তে নামছে।

অনিন্দ্য তাকিয়ে দেখল সত্যিকারের অন্ধ লোকটিও ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যেন সহানুভূতি নিয়ে অনিন্দ্যকে দেখছে, ওর কষ্ট বোঝার চেষ্টা করছে।

ডুকরে উঠল অনিন্দ্য। হাত-কাটা লোকটির একটি হাত ধরে বলল, হ্যাঁ, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মিথ্যে অন্ধ সাজার কষ্ট। বিশ্বাস করুন, আমি অন্ধ নই। শুধুমাত্র বসে যাওয়ার জন্যই অন্ধ সেজেছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি এই কালোটাকে সরাতে পারছি না। সরালেই যেন মাকে দেখতে পাব, মা ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। কথাগুলো বলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

অন্ধ লোকটি হাতড়ে হাতড়ে অনিন্দ্যর মুখ তুলে ধরে চশমাটা খুলে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললে, কোনো মা-ই তাঁর সন্তানকে ঘৃণার চোখে দেখেন না। সত্যিই যদি তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হও তাহলেই তুমি তাঁর ক্ষমা পেয়ে যাবে। তোমরা তো দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ভুল করতে করতে, আবার তা শোধরাতে শোধরাতেই তো তোমাদের জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ করতে পারবে।

চশমাহীন অনিন্দ্য পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লোক দুটির দিকে আর মনে মনে ভাবে, ভগবান কি এভাবেই পথপ্রদর্শক হয়ে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করেন!

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে ঃ

পল্লবী সেনগুপ্ত (নয়াপট্টি রোড, কলকাতা-৫৫)॥ মন্দিরা চট্টোপাধ্যায় (শ্রীপল্লী, আসানসোল)॥ প্রশান্ত ভক্ত (তাঁতবেড়িয়া, হাওড়া)॥ শংকর মহারানা (বেলদা, মেদিনীপুর)॥ রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর, হুগলী)॥ মিরোজা ইসলাম (আবুয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)॥ অন্তরা চক্রবর্তী (ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১)॥ কল্যাণময় ঘোষ (নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা)॥ দেবাশিস বড়ুয়া (দমদম, কলকাতা-২৮)॥ সুপ্রতীক দাস (সালকিয়া, হাওড়া)॥

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র, তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপকরাঃ সৌরভ কুমার ভূঞ্যা, অঞ্জনা রায়, পল্লবী সেনগুপ্ত, মন্দিরা চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত ভক্ত।

ছবি ঃ সুফি

ঘোষণা

নদীয়া জেলার মদনপুরের কল্যাণনগর থেকে বিনয় বাগচী তাঁর প্রয়াত জামাতা সুব্রত মজুমদারের নামে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাবমতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে সুব্রত মজুমদার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

সুব্রত মজুমদার
জন্ম ঃ জুলাই ১৯৭০
মৃত্যু ঃ ১৭ ডিসেম্বর ২০০০

বিষয়বস্তু
নীরব কর্মী

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ১৫ ভাদ্র। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার পৌষ সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ ১৫০ টাকা ☐ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ১০০ টাকা

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

রক্তের পরিবর্তে

রক্ত খুবই দামী। বিশেষত যখন হঠাৎ প্রয়োজন হয়। সাধারণত দাতার রক্ত গ্রহণ করে গ্রহীতা বা রোগীকে বাঁচানো হয়। হাসপাতালগুলো প্রায়শই রক্তশূন্যতায় ভোগে। রক্তের অভাবে অনেকে মারা পড়ে। কারণ রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত বেশিদিন সঞ্চয় করে রাখা যায় না। এডস বা হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলে তাদের রক্তও নেওয়া যায় না। তারপরেও রয়েছে রক্তের গ্রুপ মেলানো। রক্তে অ্যান্টিজেন যদি দাতা ও গ্রহীতার এক না হয় তাহলে রোগীর মৃত্যু হবে। এসব কথা ভেবেই কৃত্রিমভাবে রক্ত তৈরির জন্য থমাস এম. এস. চাং ১৯৬৪ সাল থেকে গবেষণা করে আসছেন। জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে তিনি রক্তের পরিবর্ত বস্তু বা কৃত্রিম রক্ত তৈরিতে সফল। এই দীর্ঘকাল তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে উৎসেচকগুলির ক্রিয়াকলাপ ও DNA-র রহস্য জানার জন্য। অন্য বিজ্ঞানীদের সফল আবিষ্কার থেকেই তাঁর আবিষ্কার। বিশেষ সেল কালচারের মাধ্যমে তিনি যে কৃত্রিম কোষ তৈরি করেন সেগুলির অতি সূক্ষ্ম পর্দা ভিতরের বস্তুকে বাইরের পরিবেশের সংস্পর্শ থেকে আলাদা করে রাখে। এর ফলে ভেতরে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তা সহজে বিনষ্ট হয় না। অক্সিজেন সহজেই ঐ পর্দা ভেদ করে হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেটা কোষ থেকে কোষে শ্বসনের জন্য পৌঁছে যায়। আবার একই পদ্ধতিতে সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। একটা অসুবিধা ছিল। এই রক্তকণিকাগুলি খুব ছোট হওয়ার জন্য সহজেই কিডনি দ্বারা দ্রুত রেচিত হয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। সে সমস্যারও সমাধান হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা প্রাকৃতিক লোহিত কণিকার মতো এরা কোনো অ্যান্টিজেন বহন করে না যার ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ফলে এই রক্ত যে কোনো রোগীকে যে কোনো সময় দেওয়া যায়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় এই রক্ত, যার নাম পলি হিমোগ্লোবিন রক্ত।

মাইক্রোস্কোপের নিচে দৃশ্যমান মানুষের রক্ত

তুমিও কি চাঁদে যাবে ?

একজন ভারতীয় হিসেবে তুমি কি চাঁদে যেতে চাও ? তাহলে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর নিজের দেশের মহাকাশ কেন্দ্র থেকে দেশেরই বিজ্ঞানীদের তৈরি মহাকাশযানে চেপে পাড়ি জমাবে চাঁদে। হ্যাঁ সেরকমই জানিয়েছেন ইসরোর (Indian Space Research Organisation) বিজ্ঞানীরা। তাঁরা উন্নতমানের ক্রায়োজেনিক ফুয়েল চালিত জিয়োসিনক্রোনাস ল্যাটেরাইট ভেহিকল (GSLV) তৈরি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন যা সহজেই চাঁদে পাড়ি দেবে। চাঁদে জল এবং হিলিয়ামের সন্ধান পাওয়ার পরই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের টনক নড়ে। তাঁরা চন্দ্র অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ ভবিষ্যতে চাঁদ হতে পারে পৃথিবীর উপনিবেশ। এই অভিযানের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে যারা খুব শীঘ্রই সরকারের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করবে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য।

এখন কী মনে হচ্ছে?.....তুমি আমার পুরোনো বন্ধু তোমায় দশ মিনিট সময় দিচ্ছি.....বিশ্রাম নিয়ে নাও....
বিশ্রাম! আমি নেবো....?? আমি তোমায় আগেই বলেছি, আমাদের মধ্যে একজন....হ্যাঁ মাত্র একজনই থাকবে.. হয় তুমি...নয়তো আমি....
হ্যাঁ, একজন বাঁচবে! মাত্র একজন!
খ..টা..শ..
সেদিন তুমি একজন নিরীহ পুরোহিতকে হত্যা করেছিলে... মনে পড়ে....
তাই আমি তোমায় মৃত্যুদণ্ডই দেবো.....এছাড়া আর কোনো শাস্তি নেই...
ভুলে যেও না মিনজাদের কাছে পরাজয় মৃত্যুরই সমান....সুতরাং.....
ব্ল্যাক ক্যাটের উদ্যত অস্ত্র নেমে এল গিলবার্টের দিকে....
হঠাৎ সানজাইদের ঘরের টিভি স্ক্রিন অন্ধকারে ঢেকে গেল....
?
ও হো..... গিলবার্ট...

গিলবার্টের পরাজয় ও মৃত্যু লুসিফার মাফিয়াদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিলো.....

আবার আমরা ব্যর্থ হলাম.....এবার আরও বিচ্ছিরি ভাবে....গিলবার্টকেও হারালাম.....

মনে হচ্ছে ব্ল্যাক ক্যাটের সঙ্গে লড়তে পারে আর কোনো যোদ্ধাই রইলো না.... তাই তো?

এবার কী হবে?

এখন যদি কেউ ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবেই আমরা বাঁচবো.....

আমাদের হীরক বাহিনীর কোনো যোদ্ধা কী আর অবশিষ্ট নেই? যারা ওকে অন্তত বাধা দিতে পারবে....

ওদের দিয়ে তো আগেই চেষ্টা করা হয়েছিল....ওরা সকলেই ওর কাছে হেরে গেছে....

ওসব দিয়ে ওর সঙ্গে লড়া যাবে না....আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে....

আতঙ্কবাদীদের সুপ্রিমোদের আলোচনা বন্ধ হয়ে এল। স্পিকারে ভেসে এল সুপ্রিমো প্রধানের গলা.....

অপেক্ষা করতে হবে আমাদের....ঠিক সময়ে আমিই বলে দেবো কী করতে হবে.... তোমরা যে যার ডেরায় ফিরে যাও.....

ব্ল্যাক ক্যাটের কাজ শেষ.....তার সামনে পড়ে আছে গিলবার্টের মৃতদেহ.....

আমি একদিন না একদিন ওদের প্রধান কর্তাকে ধরবো....ধরতেই হবে.... সেদিনই শেষ হবে সব হিসেবে নিকেশ....

সব ঝামেলা মিটে গেছে জঙ্গলে আর অশান্তি হবে না। ব্ল্যাক ক্যাট আর টাইগার ফিরে চলে তাদের ডেরার পথে....

শেষ

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার প্রশিক্ষণ

শারীরিক বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতা মানুষের জীবনে পূর্ণতা আনতে বাধা দেয়। তবে এই প্রতিবন্ধকতা-কে জয় করে অদম্য উৎসাহে এগিয়ে যাওয়ার অপর নামই কিন্তু জীবন। জীবনে যদি ঘাত-প্রতিঘাতের সংগ্রাম না থাকে তাহলে জীবন বৈচিত্র্যময় হবে কীভাবে! আর জীবনে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জই বা থাকবে কী করে? সেকারণে মানুষ চেষ্টা চালায় এসব জয় করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। উপনিষদের 'চরৈবেতি'র শাশ্বত বাণী তাকে পথ দেখায়।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির দারুণ উন্নতির দিনে দৈহিক প্রতিবন্ধকতাকে বশে আনার মানবিক প্রয়াসের শেষ নেই। এজন্য বিভিন্ন ইনস্টিটিউট স্থাপনা করা হয়েছে যাতে কিছু প্রশিক্ষিত কুশলী তৈরি করা সম্ভব হয়—ভবিষ্যতে তারা অন্যদের সাহায্য করে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারবে সন্দেহ নেই। এমনতরো কটি ইনস্টিটিউট হলো—ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেন্টাল রিটার্ডেশন ইত্যাদি। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের প্রয়াসে প্রশিক্ষক তৈরির আদর্শ ইনস্টিটিউট হলো—আলি ইয়ার জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ার হ্যান্ডিক্যাপড, মুম্বাই। এবারের আলোচনায় এই ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করব।

ইনস্টিটিউট মোটামুটি সাত ধরনের প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পড়ায়। এগুলো হলোঃ (১) বি. এড (এইচ আই অর্থাৎ হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড)। এই কোর্স পড়ানো হয় মুম্বাই কেন্দ্রে, কলকাতার আঞ্চলিক ও ওসমানিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্রে। এজন্য প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে। সাধারণত ভর্তির পরীক্ষা পরিচালনা করে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্সের মেয়াদ এক বছর।

(২) ব্যাচেলর ইন অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথলজি—এটি মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোর্স। কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বিষয়সহ কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে (সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) পাশ করতে হবে।

একই ধরনের আরেকটি কোর্স করায় হায়দরাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি। কোর্সটির নাম—বি. এসসি (হিয়ারিং, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচ)। তিন বছরের কোর্স। ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার—ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি অথবা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স সহ ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় পাশ।

কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত যে কোর্সটি পড়ানো হয় সেটি হলো—ব্যাচেলর ইন অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ রিহ্যাবিলিটেশন। এজন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার—ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সহ ১০+২ পরীক্ষায় পাশ। এটিও তিন বছরের কোর্স। তবে মনে রাখতে হবে এসব কোর্সে ভর্তি হতে হলেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হবে। এই ধরনের কোর্সে ভর্তির জন্য সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(৩) ডিপ্লোমা ইন হিয়ারিং, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচ—এই কোর্স পড়ানো হয় নয়াদিল্লি, সেকেন্দ্রাবাদ ও কলকাতা কেন্দ্রে। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথমেটিক্স বিষয়সহ পাশ করতে হবে। কোর্সটি এক বছর মেয়াদের।

(৪) স্পেশাল এডুকেশন ডিপ্লোমা (হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড)—পড়ানো হয় নয়াদিল্লি, কলকাতা, হায়দরাবাদ, ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে। ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এটিও এক বছরের কোর্স।

(৫) মাস্টার ইন অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথলজি—এই কোর্স পড়ানো হয় মুম্বাই কেন্দ্রে, এটি মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কোর্স। এটি দু'বছরের কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড কোর্সের স্নাতক হতে হবে। স্পিচ, হিয়ারিং-এর স্নাতক হলেও বাধা নেই।

(৬) এম. এসসি (হিয়ারিং, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচ)—এটি হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কোর্স। দু'বছরের কোর্স। ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে বি.এসসি এইচ.এল.এস অথবা সমতুল কোর্সের স্নাতক হতে হবে।

(৭) এম. এড হিয়ারিং (ইমপেয়ার্ড)—এটি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কোর্স। এক বছরের কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে বি. এড (এইচ আই) কোর্সের স্নাতক হতে হবে। অথবা হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড বিষয়ে স্নাতক হলেই চলবে। উপরন্তু হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড-এর শিক্ষক হিসাবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে এই যোগ্যতা শিথিল করতে পারে। প্রার্থীর বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে (স্পনসর্ডদের ক্ষেত্রে অবশ্য ৪০ বছর)।

মোটামুটিভাবে কোর্স সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া গেল।

এবার ভর্তির নিয়মকানুন বিষয়ে কিছু বলা দরকার। ডিরেক্টর, আলি ইয়ার জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, মুম্বাই অনুকূলে ৫০ টাকার ড্রাফট পাঠালে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকেও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব। যেমন—(১) অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, আলি ইয়ার জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড, নর্দান রিজিওনাল সেন্টার, কস্তুরবা নিকেতন, লাজপত নগর, নয়াদিল্লি-১১০ ০২৪।

(২) অ্যাসিঃ ডিরেক্টর, আলি ইয়ার জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, ইস্টার্ন রিজিওনাল সেন্টার, কেঃ অঃ এন আই ও এইচ (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড), বি. টি. রোড, বনহুগলি, কলকাতা-৭০০ ০৯০।

(৩) অ্যাসিঃ ডিরেক্টর, আলি ইয়ার জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, সাদার্ন রিজিওনাল সেন্টার, কেঃ অঃ এন আই এম এইচ ক্যাম্পাস, মনোবিকাশ নগর, বোয়েনপল্লী, সেকেন্দ্রাবাদ-৫০০ ০০৯।

(৪) অ্যাসিঃ ডিরেক্টর, আলি ইয়ার জং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, কেঃ অঃ ট্রেনিং সেন্টার ফর টিচার্স অফ দ্য ডেফ, এস আই আর ডি ক্যাম্পাস, ইউনিট-৮, ভুবনেশ্বর-৭৫১ ০১২, ওড়িশা।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে—হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড কোর্স পড়ে কী লাভ? আগেই বলেছি, আমাদের দেশে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মূক, বধিরদের সমস্যাও কম নয়। সুতরাং এই বিরাটসংখ্যক প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্যে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এইসব কোর্সে প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে নিজেরা ক্লিনিক খুলে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন সংস্থায় (প্রতিবন্ধী সহায়তা কেন্দ্রের) সঙ্গে যুক্ত হয়েও পরিষেবার মাধ্যমে রুজির ব্যবস্থা করা সম্ভব। সরকারি/বেসরকারি স্তরে চাকরির সুযোগ এবং সেই সঙ্গে স্বনিযুক্তির সুযোগও পাওয়া সম্ভব।

প্রকাশিত হল

অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি প্রামাণ্য বই

বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২৬৫

পরিমার্জিত চারটি নতুন অধ্যায় সম্বলিত সংশোধিত সংস্করণ

লুচি কেন ফোলে? রক্তের রঙ লাল কেন? লাল মরিচ লাল কেন? তেঁতুল কেন বেশী টক? নারকেলের তিনটি মাত্র চোখ কেন? উল্কার কি নিজস্ব আলো আছে? গাছের পাতা ঝরে পড়ে কেন? ছাতার রং কালো কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রঙ সাদা কেন?

এই ধরণের অনেক প্রশ্ন আর কৌতূহলের খোরাক আছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। অনেক ছবিতে সমৃদ্ধ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক ঐতিহাসিক প্রকাশন ।

● ● ●

অরূপরতন ভট্টাচার্য্য ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

স্বাস্থ্য যখন ভাবায় ১০০

খেতে বসে কথা বলা কি খারাপ? হোমিওপ্যাথি ও অ্যালাপ্যাথি ওষুধ কি এক সঙ্গে খাওয়া চলবে? কানে পোকা ঢুকলে কি করবো? বাড়িতে মানিপ্ল্যান্ট থাকলে কি ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া কি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর? নিম দাঁতন না টুথব্রাশ কোনটা বেশী উপকারী? চোখে গগলস সারাক্ষণ ব্যবহার করা কি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর? দেশী ডিম বা পোলট্রি ডিম কোনটা বেশী উপকারী? একটি নবজাত শিশু বধির কিনা তা কি করে জানা যায়? চুলে মেহেন্দি লাগানো কি উচিৎ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের কৌতূহলকর এই ধরণের হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বইটিতে যাতে কেটে যাবে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংশয় ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

ক্লেপ্টোম্যানিয়াক

সুরজিৎ ঘোষ

বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ! কয়েক সেকেন্ড আগে ঘরের মিউজিক্যাল কোয়ার্জ ক্লকটা সুর তুলে ঘোষণা করেছে রাত দুটো। তখনই ঘুম ভেঙে গেছিল কোয়েলার। গ্রীষ্মের ছুটিতে মাসির বাড়ি এসে এমন একটা মনের মতো কাজ পেয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি কোয়েলা। ইংলিশ অনার্সের পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শেষ হতেই ভেবেছিল এখন একটা ছোটখাটো কেস পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু পুরীতে মাসির বাড়ি বেড়াতে এসে এভাবে 'রথ দেখা কলা বেচা' একসঙ্গে হবে তা কি সৌম্যও ভাবতে পেরেছিল! দিদির ছায়াসঙ্গী সৌম্য। দিদিকে ছাড়া থাকতেই পারে না।

চোখ বুজে কল্যাণী মাসির সিঁদুর কৌটো অন্তর্ধান রহস্যের কথাই ভাবছিল কোয়েলা। হঠাৎ হালকা পায়ের শব্দ বারান্দায়—অবশ্যই কোনও স্ত্রীলোকের, বুঝতে অসুবিধে হয়নি একটুও। আড় চোখে পাশের খাটের দিকে তাকায়। পাশবালিশ জড়িয়ে সৌম্য শুয়ে আছে। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় উঠে বালিশের তলা থেকে বার করে নেয় দেড়-ফুটি লাঠি দুটো। তারপর সৌম্যর কাঁধে একবার হাত ছুঁইয়েই দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সৌম্যও যেন কলের পুতুল। মুহূর্তে উঠে বসে মশারি তুলে বাইরে এসে কোয়েলাকে অনুসরণ করে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে আসে কোয়েলা। দূরে অশান্ত সমুদ্রের গর্জন। রাতের আকাশের হালকা আলোয় সামনের বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে দূরের সমুদ্রকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিন্তু সে দিকে চোখ বা মন দেওয়ার সময় কোথায়? বারান্দার ও-মাথায় তখন স্ত্রীমূর্তি ডানধারে বাঁক নিয়েছে।

সৌম্য, ইমারজেন্সি বেলের সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে থাক। আমার সংকেত পেলেই সুইচ চেপে দিবি। চাপা গলায় নির্দেশ দিয়েই কোয়েলা যথাসম্ভব নিঃশব্দে দৌড়ে বারান্দার ও-মাথার দিকে চলে যায়।

সৌম্য বারান্দার ধারে দেওয়াল চেপে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেই কোয়েলা বুঝতে পারে স্ত্রীমূর্তি কল্যাণী মাসি ছাড়া আর কেউ নয়। খুব অবাক হয় ও। দ্রুত পদে চলমান স্ত্রীমূর্তির প্রায় পিছনে পৌঁছে যায়। মূর্তি তখন নিচের বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে সদর দরজার দিকে চলেছে।

কোয়েলা ইচ্ছে করেই বেশ জোরে আঙুলের তুড়ি দেয়। একবার, দু'বার, তিনবার—কিন্তু কল্যাণী মাসির মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। হাত বাড়িয়ে চতুর্থ তুড়িটা কোয়েলা কল্যাণী মাসির ডান কানের কাছে মারে। আর ঠিক তখনই ও ব্যাপারটা বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে ডাহুক পাখির মতো কুব্ কুব্ এক অদ্ভুত আওয়াজ তোলে। আর দেরি করলে কল্যাণী মাসি আহত হবেই। পরমুহূর্তে বেলের কর্কশ আওয়াজ, পর পর আলো

জ্বলে ওঠা, পাশের এঘর-ওঘর থেকে মানুষজনের কৌতূহলী মুখে 'কী হয়েছে' 'কী হয়েছে' শব্দে চারিদিক ভরে ওঠে।

সকলে ধরাধরি করে কল্যাণী মাসিকে ওপরে বারান্দায় নিয়ে আসে। মেসো জলের ঝাপটা মারতে মারতে বলেন, আবার পুরোনো রোগটা চাগাড় দিয়েছে! প্রায় বছর পাঁচেক বেশ ভালই ছিল!

নিচের ফ্লাইং বোর্ডাররা যে যার ঘরে চলে যায়। কল্যাণী মাসি ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় চোখ পিট পিট করতে শুরু করেন। তারপর যেন কোনও কিছুই হয়নি এমন ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যান। পেছন পেছন মেসোও ঘরে ঢোকেন।

হ্যাঁরে কইলা কী হইচে র‍্যা? সিঁড়ির ওপাশের ঘর থেকে লাঠি হাতে ঠানদি এসে দাঁড়ান। কোয়েলারা তখন সবে নিজেদের ঘরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে।

কোয়েলা কী বলবে ঠিক করে উঠতে পারে না। বৃদ্ধা আবার কাঁপা কাঁপা খোনা গলায় বলেন, এত চেঁচামেচি কীসের তরে রে কইলা? লোকগুলান গেল কই?

সৌম্য বলে, ভাঙা হাটে আইলা কানাই বাঁশি বাজাতে, এখন কি আর মিলবে দেখা—

কী হচ্ছে কি? কোয়েলার ধমকে সৌম্য কথা শেষ করতে পারে না। মুখ টিপে হাসতে হাসতে ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

কোয়েলা ঠানদিকে ধরে তাঁর ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে, চলো, চলো, ঘরে চলো ঠানদি। সব বলছি তোমায়।

ওপরের তিনখানা ঘরে কল্যাণী মাসি, কনক মেসো আর ঠানদি এই তিনটি প্রাণী। এখন অবশ্যই তিন নয় পাঁচ। মাঝের ঘরটায় দিন পাঁচেক হলো কোয়েলা আর সৌম্য এসেছে। নিচের ঘর তিনটে কলকাতার ডি. ভি. সি. অফিসের হলি-ডে হোম। পুরীতে কম-বেশি সব বাড়িতেই বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা থাকে। হলি-ডে হোমে দু-চার দিন অন্তর অন্তর বোর্ডার পাল্টায়। এরা সাধারণত ওপরে আসে না। নিচে একজন ম্যানেজার আছে। ও-ই বোর্ডারদের সুবিধে-অসুবিধে দেখে।

পরের দিন খুব ভোরে সৌম্য-কোয়েলা স্বর্গদ্বার থেকে যে রাস্তাটা সোজা দক্ষিণমুখো হয়ে শুয়ে পড়েছে সেটা ধরে জগিং করতে করতে এগোচ্ছিল।

দিদিভাই, কালকের ব্যাপারটা কিন্তু এখনও পরিষ্কার হলো না। কল্যাণী মাসির অসুখটা কী? সৌম্য শুরু করে।

সোমন্যামবুলিজম!

কী বুলিজম? সৌম্য দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোয়েলা নিজের গতি না কমিয়ে এগোতে এগোতে কী যেন বলে।

সৌম্য শুনতে পায় না। জোরে ছুটে কোয়েলার পাশে পৌঁছে ওর তালে তালে যেতে যেতে বলে, কী বললি দিদিভাই? শুনতে পাইনি ঠিক। জোরে বল।

কোয়েলা মুখে কিছু না বলে জগিং থেকে রানিং পর্যায়ে চলে যায়। সৌম্য বুঝতে পারে এখন আর হবে না। ও-ও গতি বাড়ায়।

রাস্তার ধারে সার দিয়ে দাঁড়ানো অপ্রচলিত শক্তি কাজে লাগাবার ব্যবস্থা উইন্ডমিল টাইপের গম্বুজগুলো একটার পর একটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'জনেরই বুক কামারের হাপরের মতো উঠছে নামছে। প্রায় পাঁচশ মিটার টানা জোরে দৌড়ে কোয়েলা, বাঁ ধারে সমুদ্রের কোলঘেঁষা একটা উঁচু মতন বালুচরে ধীর গতিতে গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। ওয়ার্মিং আপের পর ওয়ার্মিং ডাউন। তারপর এক এক করে বেশ কয়েকটা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করার পর দু'জনেই বালির ওপর শবাসনে রইল দু-মিনিট।

ঠানদি সম্পর্কে কতটা জানিস? কোয়েলা এবার মৌনতা ভাঙল শবাসনে শুয়েই।

প্রায় মাস পাঁচেক এখানে আছেন। হয়তো এখানেই থেকে যাবেন। অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্মপ্রাণা বিধবা। ছোটবেলায় কনক মেসোকে কোলেপিঠে মানুষ করেছেন যদিও রক্তের সম্পর্কে ওঁর কেউ নন। বর্তমানে ঠানদির নিজের ছেলে না দেখায় এখানে চলে এসেছেন কনক মেসো ওঁকে সিঁড়ির ধারের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যত দিন খুশি থাকুন, চাই কি সারা জীবন

আর কিছু?

খুব ভোরে ওঠেন। স্নান, ঠাকুর পুজো না করে জলগ্রহণ, সরি, চাগ্রহণ পর্যন্ত করেন না। বত্রিশ পাটির একটিও নেই!

আর কিছু?

একাহারী। রাতে কিছু খান না।

গুড্, এনিথিং মোর?

নো।

কোয়েলা উঠে পড়ে দেহ থেকে বালি ঝাড়তে শুরু করে। সৌম্যও দিদিকে অনুকরণ করে।

দু'জনে হেঁটে ফিরতে থাকে। পুব আকাশ রাঙা করে তখন সূর্যদেব উঠি উঠি করছেন। দূরে এক দঙ্গল জেলে বালির চরে জাল পরিষ্কার করে মাছ ভরছে হাঁড়িতে। লাল সূর্যের সামনে তাদের কালো কালো দেহ চমৎকার সিলুয়েট তৈরি করেছে।

সৌম্য বলে ওঠে, ইস, দিদি, দেখ! কী সুন্দর দৃশ্য! ক্যামেরাটা আনলে—

কল্যাণী মাসির কী কী জিনিস এ যাবৎ খোয়া গেছে জানিস? কোয়েলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ছোঁড়ে সৌম্যের দিকে।

সৌম্য ইতস্তত করে। হ্যাঁ...না... মানে কী কী আবার? ওই তো আমাদের এখানে পৌঁছনোর আগের দিন একটা দামী সোনার সিঁদুর কৌটো হাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছু তো জানি না!

তবে শোন গত পাঁচ-ছ মাস ধরে কল্যাণী মাসির মোট চারটে জিনিস খোয়া গেছে—একটা টুথব্রাশ প্রায় তিন বছরের পুরনো। কিন্তু অতি সুন্দর জাপানি ব্রাশ যার ব্রিসলগুলো নাকি এখনও একটুও নোয়ায়নি। একটা সুদৃশ্য কিন্তু অতি অল্পদামের পিতলের নটরাজ মূর্তি। একটা জার্মান সিলভারের ঝকঝকে কাজললতা আর সব শেষে তুই যেটা বলেছিস।

এ থেকে কী বোঝা যায়? সৌম্য আড়ে তাকায় দিদির দিকে।

কিছু না, আবার অনেক, অনেক কিছু! কোয়েলার গলার স্বর কেমন যেন

পাল্টে যায়। চোখের দৃষ্টিও দূর আকাশের সীমা ছাড়িয়ে যেন মহাকাশে লীন। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি বিবেকানন্দীয় কায়দায় রেখে ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে থাকে। এ ধরনের ভাবাবেশ সৌম্য কখনও আগে দেখেনি ওর দিদিভাইয়ের মধ্যে। একটু ঘাবড়িয়ে যায় ও। চুপ করে থাকে। নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে যায় মিনিট খানেক। তারপর বলে, দিদিভাই, কী হয়েছে তোর?

উঁ? কী বলছিস? কোয়েলার গলার স্বর স্বাভাবিক। দৃষ্টি আবার আগের মতো তীক্ষ্ণ। কী আবার হয়েছে? নাথিং! উত্তরটা মনে হয় পেয়ে গেছি।

মানে চোর ধরে ফেলেছিস? হুররে! সৌম্য লাফিয়ে উঠে আকাশে হাত ছোঁড়ে। কে রে দিদিভাই? নিশ্চয় ওই বিন্দি পিসি? প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ও ছাড়া আর কে-ই বা হবে?

বিন্দি পিসিকে কতটুকু চিনিস?

কল্যাণী মাসিদের সর্বক্ষণের কাজের মাসি। প্রতিদিন সকালে আসে, রাত আটটা-নটায় যায়। সারা দিন বাড়িতে কাজ করে। বাড়ির সর্বত্র ওর অবাধ যাতায়াত। গত পনের বছর ধরে কাজ করছে। কল্যাণী মাসির কথা অনুসারে ওঁরা বাইরে কোথাও গেলে বাড়ির চাবি পর্যন্ত ওর কাছে রেখে যান।

তাহলে কল্যাণী মাসিদের গত পনের বছরে বহুবার সর্বস্বান্ত করার সুযোগ বিন্দি পিসি পেয়েছিল। কোয়েলার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

রাস্তায় পড়ে থাকা একটা পেপসির ক্যানে এক লাথি হাঁকড়িয়ে সৌম্য বলে, কারেক্ট। আমার বক্তব্য আর সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে। তা হলে— সৌম্য শ্রাগ করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় কোয়েলার দিকে।

'নিশি পাওয়া' বুঝিস? কোয়েলা প্রসঙ্গ পাল্টায়।

ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়ানো ?

একজ্যাক্টলি! ওরই গালভরা ইংরেজি নাম সোমন্যামবুলিজম! কল্যাণী মাসি মাঝে মাঝে ওই অসুখেই ভোগেন।

কিন্তু চোর কে? সৌম্য স্বগতোক্তি করে।

হঠাৎ কোয়েলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওই কল্যাণী মাসির বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ।

রান, লেটস সি হু ক্যান রিচ দেয়ার ফার্স্ট!

দু' জনেই দৌড় লাগায়।

জগিং সেরে বাড়ি ফেরার পর থেকে রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ কোয়েলা ঠানদির যেন ন্যাওটা হয়ে কাটাল। ঠানদির স্নানে সাহায্য করা, পুজোর সময় মূর্তির সামনে হাতজোড় করে বসে থাকা, এমনকি খাওয়া পর্যন্ত ঠানদির সঙ্গেই সারল কোয়েলা। দিদির রকম-সকম দেখে সৌম্য অবাক।

পরের দিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। সকাল নটা নাগাদ হঠাৎ ঠানদির ছেলে এসে হাজির। মায়ের পা ধরে তার সে কী আকুল কান্না! নিজের ভুল বুঝে মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। মা যদি তার সঙ্গে না যায় তবে নাকি তার নরকেও ঠাঁই হবে না। ছেলের চোখের জলে মায়ের মন গলল। ঠানদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন। কনক মেসো সে সময়ে বাড়িতে ছিলেন না, বাজারে গেছিলেন। তাঁকে বলার মতো ধৈর্যও তাঁর নেই।

কোয়েলা সৌম্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, গড ইজ গুড। ভগবান তুমি সত্যিই মঙ্গলময়।

সৌম্য বলে উঠল, আমে দুধে এক হয়, আঁটিখানি পড়ে রয়।

সে দিনই সন্ধ্যেবেলা চায়ের টেবিলে কোয়েলা একটা ছোট মাপের চুমকি বসানো সিল্কের থলি থেকে একটা একটা করে হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলো সামনের টি টেবিলে সাজিয়ে যখন রাখল, তখন ঘরে আরও চারটি প্রাণী থাকলেও সূচপড়া নৈঃশব্দ্য।

বিন্দি পিসিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। দিদিমণি, তুমি কি সেই পি. সি. সরকার নাকি! এগিয়ে এসে হাত দিয়ে একটা একটা করে জিনিস হাতে নেয়। ছুঁয়ে পরখ করে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেয় কল্যাণী মাসির দিকে। কল্যাণী মাসি সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তুলে দেন কনক মেসোর হাতে। সুদৃশ্য জাপানি টুথব্রাশ, পিতলের নটরাজ, জার্মান সিলভারের কাজললতা, সোনার সিঁদুর কৌটো—একে একে টেবিলের এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গা দখল করল।

চোর দেখছি খুব সমঝদার! কনক মেসো বললেন। নটরাজ, কাজললতা, সিঁদুর কৌটো খোয়া যাওয়ার সময় তো এতটা চকচকে ছিল না। এগুলোকে দেখছি নিয়মিত ঘষামাজা করা হয়েছে! কি তাই না? কল্যাণী মাসির দিকে তাকালেন তিনি।

কল্যাণী মাসি তখনও গুম। ঈষৎ বিস্ফারিত নেত্রে কোয়েলার দিকে তাকিয়ে। স্বগতোক্তি করে ওঠেন হঠাৎ, আমি ভাবছি সিঁদুর কৌটো, কাজললতা তো মোটামুটি দামী জিনিস। কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা টুথব্রাশ চুরি করে এ কী চোর!

কনক মেসো কোয়েলার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক। বলো মা, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দাও।

মেসোমশায়, আপনারা কিন্তু চায়ের কথা ভুলেই গেছেন! অবশ্য ওই পেটুকটা ছাড়া। আড় চোখে তাকায় সৌম্যর দিকে।

সৌম্যর চা তখন প্রায় শেষ। টেবিলের ওপর থালায় চুড়ো করে রাখা বিস্কুট, চিপসের সঙ্গে তখন ও সখ্যতা করছে। ভাবখানা এমন যেন দিদির কথা শুনতেই পায়নি।

কনক মেসো সুড়ুৎ করে আওয়াজ তুলে চায়ে চুমুক দিয়েই কাপটা রেখে দিয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকালেন বিন্দি পিসির দিকে। বিন্দি পিসি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল কাপটা হাতে নিয়ে।

কল্যাণী মাসি শাড়ির আঁচল দিয়ে কাজললতা, সোনার সিঁদুর কৌটো মুছতে মুছতে বললেন, সত্যি এগুলো যেন ঝকঝক করছে গো!

কোয়েলা মা, তুমি কিন্তু আমার কথাটা এড়িয়ে গেলে। কনক মেসোর

গলায় প্রচ্ছন্ন অভিমান।

মেসোমশাই, আমি কিন্তু বলেছিলাম, আপনাদের খোয়া যাওয়ার জিনিস ফিরিয়ে দেব। কে চোর সে কথা জানতে চাইবেন না।

তবু কৌতূহল তো একটা থেকেই যায়। কল্যাণী মাসি বলে ওঠেন। তাঁর দৃষ্টিও কোয়েলার মুখে নিবদ্ধ।

বারান্দার খোলা জায়গা দিয়ে দূরে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কোয়েলা বলে, আজ আমাকে মাপ করে দিন। পরে একদিন হবে এখন।

বিন্দি পিসি ধূমায়মান চায়ের কাপ এনে কনক মেসোর সামনে রাখলেন।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে কনক মেসো স্বস্তিসূচক 'আহ' শব্দ করে বললেন, ওক্কে, কোয়েলা। হান্ড্রেডস অব থাউজ্যান্ডস অব থ্যাংক্স টু ইউ ফর ইয়োর পারফরম্যান্স!

মেসোমশায় ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না। এটা এমন কিছু কৃতিত্বের কাজ নয়।

পরের দিন রাত ৭টা ৫৫ মিনিটের জগন্নাথ এক্সপ্রেস যখন পুরী ছেড়ে কলকাতার দিকে যাত্রা শুরু করল, তখন সৌম্য কোয়েলার কানে কানে বলল, তা হলে দিদিভাই, তুমি চাও না যে চোরের শাস্তি হোক!

কোয়েলাও ক্ষীণস্বরে বলল সৌম্যের কানে কানে, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয় সত্য। কিন্তু চুরি করা যার বাতিক বা ম্যানিয়া তাকে সঠিক অর্থে চোর বলা যায় না। তার শাস্তি নয়, দরকার মানসিক চিকিৎসা। জিনিসের দাম দেখে এরা চুরি করে না, চোখে ধরলেই তা নিয়ে নেয়। সম্পূর্ণ টেকো মানুষ চুরি করতে পারে একটা সুদৃশ্য চিরুনি। আবার সেটা...

বিপরীত দিকের সীটে বসা মাথাজোড়া চকচকে টাকপড়া এক প্যাসেঞ্জার প্রথম থেকেই কোয়েলা-সৌম্যকে লক্ষ্য করছিলেন আড়চোখে। তিনি হাঁচি-কাশির মাঝামাঝি এক বিশাল বেমক্কা আওয়াজ তুললেন।

বলেছিলাম, জিনিস ফিরিয়ে দেব।

সৌম্য একটু চমকে উঠে বলে, এ তো কাচি! তাই না দিদিভাই? চোখের কোণ দিয়ে তাকায় বিপরীত সীটের ভদ্রলোকের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে কোয়েলা ধমকে ওঠে, স্টপ টকিং ননসেন্স। সিরিয়াস কথার মাঝে চ্যাংড়ামোর কোনও মানে হয়?

কোয়েলার চাপা ধমকে ভদ্রলোকও ঘাবড়ে যান। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে তাঁর দৃষ্টিকে বাইরে ছড়িয়ে দেন। যে পাখির পালকটা দিয়ে এতক্ষণ নাক খোঁচাচ্ছিলেন, তা বুকপকেটে জমা করেন।

কে এল ই পি টি ও এম এ এন আই এ—ইংরেজির বর্ণগুলো কেটে কেটে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে কোয়েলা সৌম্যকে জিজ্ঞাসা করল, শব্দটা শুনেছিস আগে?

ইয়েস ম্যাডাম। ডিকশনারিতে দেখেছি। ক্লেপ্টোম্যানিয়া, অর্থঃ চৌর্যোন্মাদ।

বল দেখি, ও বাড়ির ক্লেপ্টোম্যানিয়াক কে? প্রশ্নটা করে কোয়েলা জানলার রডে মৃদু টোকা দিয়ে গুন গুন করে 'উই শ্যাল ওভারকাম' গান শুরু করল।

সৌম্য কয়েক সেকেন্ড দু'চোখ বন্ধ করে ভাবল। তারপর ছন্দ করে বলল,

বার নং ব্যঞ্জন পাশে আহা আ।
ত বর্গের একেবারে শেষে চলে যা।।
সেথা হতে দুই ধাপ পিছিয়ে আসি।
তারপর যোগ করি শুধু স্বর ই।।

কোয়েলা গুন গুন থামিয়ে ডান হাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল।

ছবি : রঞ্জন দত্ত

নতুন শব্দমালা

[এবারের শব্দমালাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে নেওয়া]

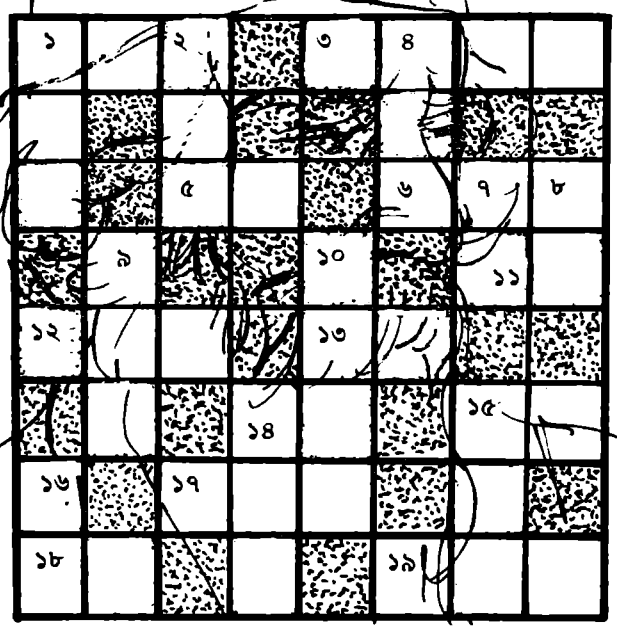

এটি তৈরি করেছেন বনবীথি পাল ও শঙ্খসাথী পাল, কাটোয়া, বর্ধমান।

সূত্র

পাশাপাশি ঃ

১. মনে করো, যেন __ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।

৩. __র কামরায় হঠাৎ দেখা
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।

৫. __ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী।

৬. __ কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।

১১. __যাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম

১২. __ গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

১৩. মহা__ ভয়ে থাকে পুলিশের থানাতে,
আইন বানায় যত পারে না তা মানাতে।

১৪. আমার মাথা __ করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।

১৫. আমি __ দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি।

১৭. ওরে __, ওরে আমার কাঁচা।

১৮. __ করে জ্বালাতন আছিল সবাই;
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

১৯. __ মরণে, শোকে-আনন্দে
তুমি ধন্য ধন্য হে।

উপর-নিচ ঃ

১. __ মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা।

২. __ শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে।

৪. কে __ মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।

৭. অল্পেতে খুশি হবে, দামো__ শেঠ কি?

৮ তখন করিনি, __, কোনো আয়োজন।

৯. __ হাওয়ার, বাদল-দিনে,
পাগল আমার মন জেগে উঠে।

১০. আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর __ ভৃত্য।

১৪. ফাগুনের __ আনন্দে।

১৫. __ পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।

১৬. তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ
আমি আজ __ বটে।

নতুন ধাঁধা

১. আদি অন্তে শক্তি দেয়
আদিহীন সমষ্টি
অন্ত ছাড়া পাজি অতি
দেওয়া নেওয়া হলো ইতি।

পিন্টু ও অনুপ
গৈরা/বাঁকুড়া

২. পেট কাটলে ফল বেরোবে
জমির বাঁধ আগে
শেষ দু'ঘরে গানের রানী
পায়ের সাজে লাগে।

বাবলু কাজী
ছত্রিশগণ্ডা/বর্ধমান

৩. আস্ত বাঁদর
খাও জবর।

অসীম ও অনিল
সাহাপুর/মালদহ

৪. আগা বাদে নিতে বলে
পেট কাটলে বলতে বলে
তিনে মিলে বিবাদ করে।

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
সল্টলেক/কলকাতা

মজার পাতা

বিকির অঙ্কের মজা

'৪৫'-সংখ্যাটাকে এমন চারভাগে ভাগ কর, যে প্রথম ভাগকে ২ দিয়ে যোগ, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ২ বিয়োগ, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়ে গুন এবং চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়ে ভাগ করে সামগ্রিক ফল '৪০'- থাকবে।

এ মাসের প্রশ্ন

ছবিটি কার ?

ইনি কি আবিষ্কার করেন ?

ফুটকি থেকে ফুটকি

আষাঢ় সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর ঃ

১. পায়রা ২. বাগান ৩. আহার ৪. বাহুল্য

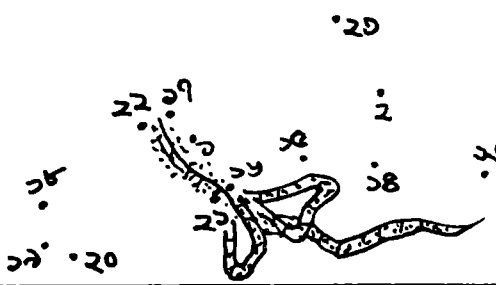

আষাঢ় সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর ঃ

পাশাপাশি ঃ ১। সরমা ৪। ধাত্রী ৫। পটোলচেরা ৭। দৃক ৯। পত্র ১০। তালেবর ১২। মহি ১৩। রদ ১৪। মানকলি ১৬। সাম ১৭। তালি ১৮। তুলকালাম ২০। তাল ২১। শাকুন

উপর-নিচ ঃ ১। সমাদৃতা ২। মাপ ৩। কলত্র ৪। ধারাবাহিকতা ৬। টোপর ৮। কলের পুতুল ১১। বদ ১২। মন ১৪। মামলা ১৫। চুনকালি ১৬। সাকার ১৯। মশা

বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

।। কলকাতা ।।

রত্না, তাপস, অভয়, পূরবী ও সৌভিক বসু/অটল বিহারী বসু লেন, কল-১১; প্রমথেশ, শতরূপা, সুশান্ত, শান্তনু, জিৎ, মুনিয়া ও বাবসুএয়/হিন্দুস্থান পার্ক, কল-২৯; ববি, জুলি, অংশু, টুকটুকি, সৌরভ, বুড়ি, মেঘা ও শান্তনু/সি. ই. সল্টলেক, কল-৬৪; কাঞ্চন, দুলাল ও ঋতুপর্ণা কর্মকার/সিমলা রোড, কল-৬; লক্ষ্মীশ্রী, শিবব্রত, রাজরানী ও নির্মল কুমার লাই/যশোর রোড, কল-৮১; দেবস্মিতা সাহা/বাগমারি সি. আই. টি. বিল্ডিংস, কল-৫৪; মীনাক্ষী, দীপা ও অরূন চক্রবর্তী/পাটুলী, কল-৯৪; জয়তী, জয়ন্ত ও সুমন্ত মিত্র/শরৎ চ্যাটার্জী রোড, কল-৮৯; বুকাই সোনা, মিতুন, তাপস, পম্পা, ঝম্পা, চুনী ও অমিয় লাই/আগরপাড়া, কল-৫৮; নবারুণ, প্রিয়ম, মীনাক্ষী, দাদাভাই ও তপনজ্যোতি ভৌমিক/মীনাক্ষী হাউসিং কমপ্লেক্স/তেঘরিয়া, কল-৫৯; চন্দ্রাণী, বৈশাখী, ছায়া ও অমলেন্দু ঘোষ দস্তিদার/বিবেকানন্দ পল্লী, বেহালা, কল-৩০;

।। ২৪ পরগনা (উঃ/দঃ) ।।

পরশ, মামণি, পবন, রানী, টুটুল, লিলি, দীপ, বিলাস, কুণাল, রাজ, বুন্টি, বন্দনা, কুমকুম, ঝুমঝুম, দোয়েল ও আমন/সাউথ কাজীপাড়া, বারাসাত (উঃ); বর্ণালী পূততুণ্ড/চণ্ডীগড়, মধ্যমগ্রাম (উঃ); সমীরণ রায়/গোবরডাঙা রেল কোয়ার্টার, খাটুরা (উঃ); সাবির, চম্পা, জাকির, রাণু, নেজাম, রোকেয়া, হাসানুর, রীনা, হাফিজুল, জুলফিকার, খোকন, ইনজামাম, হালি, নশেদ ও বাবুসোনা/খামারপাড়া, তারাগুনিয়া (উঃ); সৌম্য ও শমিত বটব্যাল/বেলিডাঙা, দক্ষিণ বারাসাত (দঃ); মুন্না, রিনা ও মুক্তো/জামিরগাছি, সোনপুর (দঃ); সঙ্কর্ষণ, সৌতম, দিলীপ, সোমেন, কল্যাণ, শুভ্রাংশু, অপূর্ব, দীপঙ্কর ও দীনেশ/বিবেকানন্দ মেস, ঘোষপাড়া, সোনারপুর (দঃ); শিপ্রা, পূরবী ও অসীম মুখার্জী/উত্তরায়ণ, নৈহাটী (উঃ);

।। হাওড়া ।।

প্রদীপ ও অপর্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী/বিনোদ বিহারী হালদার লেন, শিবপুর; অমিতাভ, অরুণাভ ও অরিন্দম ঘোষ/সদর বক্সী লেন; বুম্বা ও ডোরা মুখার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর;

।। হুগলী ।।

দেবাশিস, স্নেহাশিস ও দিয়া চট্টোপাধ্যায়/এল. এস. ভট্টাচার্য স্ট্রিট, শ্রীরামপুর; তিস্তা সরকার/নবপল্লী, শেওড়াফুলী; রূপংকর, অভিরূপ ও উপমন্যু/রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া; সোমা, উস্রী ও অরুণিমা/মাহেশ; অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ/ইন্দিরা পল্লী, আরামবাগ; অনিন্দিতা, দেবজ্যোতি ও দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য/ইন্দিরা পল্লী, আরামবাগ; বাচ্চু, টুলু ও রুদ্র ঘোষ/লেকপাড়া, আরামবাগ; সায়ন, স্বাতী, অরিন্দম, অপর্ণা, সুকুমার, বিজয়, চিত্রা ও উমা/জমিদার রোড, শেওড়াফুলী; দিগন্ত, পূর্বাশা, বিজলী ও আশিস কোলে/বড়সরসা, ইটাচুনা;

।। বাঁকুড়া ।।

ডলি, বকুল, মুকুল ও দেবিদাস ব্যানার্জী/দিগপাড়, চাটুজ্যেপাড়া; ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক ও দেবিদাস ব্যানার্জী/চাতরার মোড়, দাসদীঘি; দেবতনু, দেবিদাস, পুতুল ও তৃপ্তা ব্যানার্জী/দিগপাড়, বাঁড়ুজ্যেবাড়ি; অনির্বাণ পাত্র/হাতিরামপুর; শিঞ্জিনী ঘোষ ও সৈকত হাজারী/সারদা পল্লী, নতুন চটি; নিসর্গ, রেখা ও কাঞ্চন কুমার দাস/বেলিয়াতোড়; সাম্যজিৎ, দূর্ব ও জহর বসু/রেল কোয়ার্টার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে;

।। বর্ধমান ।।

অভীক ও অন্তরা বাউরী/শান্তিপথ, সি-জোন, দুর্গাপুর-৫; রিম্পি ও বিটু/আনন্দ বিহার, দুর্গাপুর; সুমেধা, সুশ্বেতা, দেবপ্রভূতি ও ঋতুপর্ণ/বার্নপুর; সাণ্টে ও দাত্তে/ধর্মপল্লী, আসানসোল; অমৃতা, স্বর্ণাভ, তিতলি, দিয়া ও বক/নতুনগঞ্জ; বাসবী, যশোধারা, শতভিষা ও ডাঃ উত্তম কুমার বটব্যাল/আলডি অফিসার্স কোয়ার্টার, আলডি; মিষ্টি, কমু, মানতা, বান্টু, টিনি, তিতির ও ডাঃ উত্তম কুমার বটব্যাল/আর্যাবর্ত, দুর্গাপুর-৬; অভিজিৎ চ্যাটার্জী/শিবপুর, জামুরিয়া; বনবীথি ও শঙ্খসাথী পাল/সুবোধ স্মৃতি রোড (বাইপাস), কাটোয়া; বাবা, মা, শুক্লা, কুন্তলা ও তিন্নি/আমবাগান, বার্নপুর;

।। নদীয়া ।।

অতনু, শান্তনু, মহাশ্বেতা ও মা/বাদকুল্লা; সোহম, কৃষ্ণা ও প্রলয় দে/কল্যাণী; মোহনা, সোনিয়া ও খন্দকার মোনেম/কৃষ্ণগঞ্জ;

।। মেদিনীপুর ।।

শিবানন্দ, সুমন, নিবেদিতা ও সংগীতা বেরা/মেনকাপুর; অনিন্দিতা, অরিন্দম ও অমৃতা গিরি/বাসুদেবপুর, অমর্ষী; কল্লোল ও কৌস্তভ দাস, নন্দ হেমব্রম, রাজু, বিজু, বজু ও টাটাবাবু/শালীকোঠা; দিলীপ, দীনেশ, অনুপ ও গৌরী/শ্রীচন্দনপুর; অলক, পিন্টু, পীযূষ ও মধুসূদন শাসমল/শোনপুর; শাক্যসিংহ, অর্চনা, অরুন ও অঞ্জনা/সিলিপয়েন্ট; ডাঃ সমীর, রত্না, মাম্পি, শিপ্রী ও প্রতিমা/সাউটিয়া; প্রণব, নন্দিতা ও অনুমিতা দাশ/কে. টি. পি. পি. টাউনশিপ; শান্তি, মুক্তি, ভক্তি, গায়ত্রী, শিউলি, রীতা, লাভলি, পীযূষ, মৌলি, সৌরভ, শতাব্দী, শতদ্রু ও রিয়া দাশ/দাঁতন; জুপিটার, দীপ্তেশ, সন্দীপা, মণিদীপা, দীপান্বিতা, গীতা, সরোজিনী, সঞ্জীব ও রাজীব জানা/শেরপুর বাইপাস, কাঁথি;

।। জলপাইগুড়ি ।।

দেবু, গীতশ্রী ও অরুণাভ চক্রবর্তী/ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনি, আলিপুরদুয়ার জং; সমর ও বেলা দে/ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনি/আলিপুরদুয়ার জং;

।। পুরুলিয়া ।।

দীপক, সৌমেন, রিয়া ও প্রিয়া চৌবে/আনাড়া গ্রাম;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস/এ. সি. রোড (পূর্ব), খাগড়া;

।। উত্তর দিনাজপুর ।।

প্রাপ্তি, পিকী ও ডাঃ বিপ্লব কুমার দাস/ডানখোলা;

।। অসম ।।

রেশমী, গীতা ও উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং;

।। কর্ণাটক ।।

রীতম ভট্টাচার্য/ব্যাঙ্গালোর;

।। ঝাড়খণ্ড ।।

নিরঞ্জন, রুবেন, শুভেন, বুবুন, রিচিক ও চুমকি করগুপ্ত/জামশেদপুর-৫।

আজব খবর

বরুণ মজুমদার

বৃহত্তম মিষ্টি পাঁউরুটি

মেক্সিকোর একদল পাঁউরুটি প্রস্তুতকারক বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিষ্টি পাঁউরুটি তৈরি করে গিনেস রেকর্ড ভেঙেছেন বলে দাবি করেছেন। তাঁরা ১৩ টন ওজনের 'হাজার বছরের মিষ্টি রুটি' শীর্ষক বান তৈরি করেছেন। এটি লম্বায় ১.৬ কিলোমিটার এবং চওড়ায় ৫০ সেন্টিমিটার। এই মিষ্টি পাঁউরুটি ১৯৯৯ সালের ৪ জানুয়ারি স্যাঁকা হয়েছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে কেটে কেটে বিতরণ করা হয়েছিল। ঐ বিরাটাকার মিষ্টি পাঁউরুটি তৈরিতে তিন হাজার লোক স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছিল। এতবড় একটা মিষ্টি রুটি তৈরি করতে তিন হাজার ডিমসহ যে প্রচুর মালমশলা লেগেছিল তা সবই এসেছিল জনসাধারণের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেকে।

টস

শুভ সরকার

জ্বর এসেছে ছোট নাতির খবর পেতেই ফোনে
দেখতে যাবেন শান্তিবাবু নিলেন ভেবে মনে।
অফিস থেকে মেয়ের বাড়ি ঘণ্টা দুয়েক লাগে
হাফ-ছুটিটা নিলেন বলে পৌঁছে গেলেন আগে।
সঠিক ওষুধ-পথ্যে যখন নামল নাতির তাপ
শান্ত হয়ে শান্তিবাবু খেলেন চা এক কাপ।
তারপরেতে মেয়েকে বলেন—'যাই রে এবার বাড়ি
অন্য দিনে যাই তো ফিরে অনেক তাড়াতাড়ি।'

হাওড়া এসে নামেন যখন তখন দশটা বারো
জনাই ফেরার শেষ গাড়িটা করছে ছাড়-ছাড়।
ঘুমের আগের ঘুমটি দিয়ে নামেন লোকাল থেকে
শীতের রাতে রিকশা কোথায়!—বৃথাই ডাকেন হেঁকে।
একাই এবার ধরেন হাঁটা—'জয় দুর্গার জয়'
খোকাবাবুর জলার ধারে ছিনতাইয়ের ভয়।
যা ভাবা তাই জলা পেরোতেই হঠাৎ উদয় দুজন
বেঁটের পাশে ঢ্যাঙা—ওরা কুজন নাকি সুজন!
'একটা টাকার একটা কয়েন পারেন দিতে দাদা?'
দাঁড়ায় ঢ্যাঙা সামনে এসে হাঁটায় পড়ে বাধা।
কাঁপা হাতে 'কয়েন' দিয়ে ভাবেন এ কি হলো—
কপালটা তাঁর ভাল—নাকি ছিনতাইটাই জোলো!
ব্যাগ পকেটে পুরে আবার বাড়ান হাঁটার গতি
'একটু দাঁড়ান'—পিছনে ঢ্যাঙার শীতল গলা অতি।
'কয়েনটা কি এমনি নিলাম?—রেজাল্টটা যান জেনে
ব্যাগটা আমার, ঘড়িটা ওর—হেড-টেলটা মেনে।।'

টক্কা টরে টক্কা

অরুণ ঘোষাল

টক্কা টরে টক্কা
সাপের কাছে খবর গেল
নেউল গেছে অক্কা।

টক্কা টরে টক্কা
হুলো বেড়াল ওত পেতেছে
ধরবে কখন লক্কা।

টক্কা টরে টক্কা
শ্যাওড়া গাছে স্কন্দকাটা
বাজায় বসে ঢক্কা।

টক্কা টরে টক্কা
লুডোর ঘুঁটি চালছে দাদা
পড়ছে নাকো ছক্কা।

টক্কা টরে টক্কা
কে যাবি বল চাচার সাথে
হজ করতে মক্কা।

টক্কা টরে টক্কা
হাত গলিয়ে দেখি বাবার
পকেট দুটোই ফক্কা!!

ভাল্লাগে না

অতীন বসু

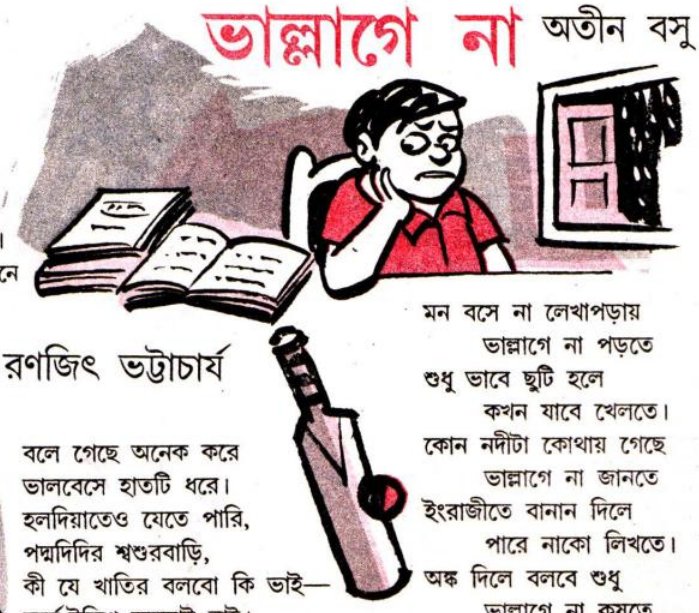

মন বসে না লেখাপড়ায়
ভাল্লাগে না পড়তে
শুধু ভাবে ছুটি হলে
কখন যাবে খেলতে।
কোন নদীটা কোথায় গেছে
ভাল্লাগে না জানতে
ইংরাজীতে বানান দিলে
পারে নাকো লিখতে।
অঙ্ক দিলে বলবে শুধু
ভাল্লাগে না কষতে
বেশি সময় পড়ার ঘরে
ভাল্লাগে না বসতে।

আসছে পুজোয়

রণজিৎ ভট্টাচার্য

আসছে পুজোয় এবার ট্যুর
মাসির বাড়ি সজলপুর
সেখান থেকে বদ্যিবাটি,
বাবার পিসির ভিটেমাটি,
চকমিলানো বিরাট বাড়ি
সবই আছে, আরাম ভারি।
বুম পিসিরাও লিস্টে আছে
বাউড়িয়া তো হাতের কাছে।
নইলে যাবো ঝাড়সুগুদা।
বাসুবাটির নুরুল হুদা
বলে গেছে অনেক করে
ভালবেসে হাতটি ধরে।
হলদিয়াতেও যেতে পারি,
পদ্মদিদির শ্বশুরবাড়ি,
কী যে খাতির বলবো কি ভাই—
সর্ষে-ইলিশ তুলনাই নাই।
শেষ টার্গেট মন-টাটকা
তুষার-রানী কামচাটকা।

ছবিঃ সুফি

গেছো ও মেছো

অশোক লাখদার

বোস পাড়ার শেষদিকে চাতরার পুকুর। পুকুরটা একেবারে এঁদো। কোমর পর্যন্ত তার জল। সেই জলের উপরে কচুরিপানা আর কলমি শাকের দাম। তার নিচে থাকত মেছো ভূত। পুকুরের চারদিকে ছিল শ্যাওড়ার বন। সেই বনের সবচেয়ে প্রাচীন শ্যাওড়া গাছের মগডালে বাস করত গেছো নামে আর এক ভূত।

মেছো ছিল খুব পেটুক। সব সময় শুধু খাই খাই করত। পেটে যেন তার যক্ষ ছিল। আর গেছো ছিল একেবারে হাড় কেপ্পোন। ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। দুজনের মধ্যে যেমন ছিল ভাব তেমনি ছিল ঝগড়া। ভোর না হতেই মেছো বাসি মুখেই বেরিয়ে পড়ত খাবারের সন্ধানে। তাকে দেখতে ছিল বিদকুটে। হাত-পায়ের হাড়গুলো ছিল ঝাঁটার কাঠির মতো লম্বা লম্বা। মুখের উপর পাটির সামনের দুটো দাঁত ছিল ভাঙা। কথা বললেই জিভ বেরিয়ে আসত দাঁতের ফাঁক দিয়ে। ওদের জাত ভাইয়েরাও ওর এই কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে ভয় পেত। এমন বাঁজখাই গলায় কথা বলত, যে শুনতো তারই পিলে চমকে উঠত।

গেছোকে দেখতে ছিল ঠিক তার উল্টো। নারকেল মালার মতো মাথার খুলি, পাকা করমচার মতো দুটো চোখ, জামরুলের মতো নাক আর দাঁতগুলো ছিল ধানী লঙ্কার মতো ছোট ছোট। হাসলে কি ভালই না দেখাত তাকে।

দিনের বেলায় হাওয়ায় ভর করে মেছো দেশ-দুনিয়া ঘুরে ঘুরে বেড়াত খাবারের সন্ধানে। বিয়েবাড়ি, শ্রাদ্ধবাড়ি, অন্নপ্রাশন, পৈতে একটা না একটা ঠিক খুঁজে পেতই। ব্যস, পেলেই সেই অনুষ্ঠান বাড়ির আশেপাশে কোনো গাছের উপর ঘাপটি মেরে বসে রান্নাঘরের দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকত। বাতাসে লুচির গন্ধ, মাছ ভাজার গন্ধ, মাংসের গন্ধ ভেসে আসত আর ওর জিভ দিয়ে টপটপ করে নাল পড়ত। রান্না হবার পর সমস্ত খাবার যখন একটা ঘরে সাজিয়ে রাখত ঠিক তখনই মেছো গাছ থেকে নেমে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে সেসব গপগপ করে খেয়ে পালিয়ে যেত। এদিকে অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার-দাবার কম পড়ত। লেগে যেত ঝগড়া হালুইকর আর বাড়ির মালিকের সঙ্গে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারত না। মাঝরাতে মেছো ফিরে আসত পেট মোটা করে এঁদো চাতরার পুকুরে। শ্যাওড়া গাছের কাছে এসে বড় বড় ঢেঁকুর তুলত হেউ-হেউ করে। গেছো তখন ময়লা ফেলার জায়গা থেকে পাড়ার লোকের এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে এনে মহানন্দে খেতে ব্যস্ত। দাঁতের ফাঁকে কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে মেছো বলত, জানিস গেছো, আজকের খাওয়াটা ঠিক জুতসই হলো না।

কেন রে? চোখ কপালে তুলে বলত গেছো।

নাক-মুখ সিঁটকে মেছো বলত, আরে দুর দুর, বাড়ির মালিক হলো তোর মতো মহা কিপটে। প্রেজেনটেশন পাওয়ার জন্য গাঁসুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন করেছে আর হালুইকর রান্নার জন্য যা যা আনতে বলেছিল তার অর্ধেক এনেছে। তাতে কি আর ভাল রান্না হয়? তেল কম, ঘি কম, মশলা কম। নাঃ! আজকের দিন ভাল গেল না।

ঐরকম এক একদিন এসে খাওয়ার নানান গল্প বলত।

গেছো মুখঝামটা দিত, উঁ! নাক নেই তার নাকের বাহার! বলি খাচ্ছিস তো চুরি করে, তাহলে আবার নাক সেঁটকানো কেন বাপু! বুঝবি বুঝবি, যেদিন ওঝার মুড়ো খ্যাংরার ঝাড়ন পড়বে মুখে সেদিন বুঝবি। এখনও তো ঝাঁটাপেটা খাসনি তাই। যেদিন খাবি সেদিন থেকে চুরি করে খাওয়া বেরিয়ে যাবে।

দুর-দুর আমায় ঝাঁটাপেটা করবে এমন ওঝা-গুণীন এখনও জন্মায়নি। আসলে তুই আমার এই ভালমন্দ খাওয়া সহ্য করতে পারিস না, হিংসে হয়, তাই তুই আমায় ভয় দেখাস। তোকে আমি চিনিনে, মেলেচ্ছো কোথাকার! ভূতেদের মুখে চুনকালি লাগালি। লোকের এঁটো কুড়িয়ে খাস। যা-যা, এঁটোকাঁটা খা। আমি যাই, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

বড় বড় হাই তুলতে তুলতে মেছো পুকুরে নেমে কলমির দামে গা এলিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই নাক ডাকতে শুরু করে। এমন বাজখাঁই তার নাক ডাকার আওয়াজ যে গেছোর কিছুতেই ঘুম আসে না। সারা রাতটা তার জেগেই কাটে।

সেদিনও ভোর না হতেই মেছো বেরিয়ে পড়ে। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছে। বড় বড় চোখ বার করে চতুর্দিক দেখে। খুব জোরে নিশ্বাস নিয়ে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে কোথাও কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি হচ্ছে কিনা। জষ্টি মাসের কাঠফাটা রোদ্দুর। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে গেল। পেটের ভেতর যেন খাঁ-খাঁ করছে। কোনো জায়গায় কোনো অনুষ্ঠানই আজ নজরে পড়ছে না। এমন তো হয় না। মেছো ভাবে আজ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, হ্যাঁ, ঐ ব্যাটা হাড়কেপ্পোন গেছোর মুখ দেখে, তাই এই অযাত্রা। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, দাঁড়া, আজ বাড়ি যাই, দেখাব মজা।

দুপুর তখন তিনটে, কোথাও কিছু না পেয়ে খিদে-তেষ্টায় আড়ষ্ট হয়ে এক তালগাছের মাথায় বসে পড়ে মেছো। বসে বসে ভাবতে থাকে খালি পেটে রাতটা কাটাবে কি করে। এমন সময় তার চোখ যায় দূরে এক ছোট্ট গ্রামে। হ্যাঁ, ঐ তো প্যান্ডেল হয়েছে, বেশ কিছু লোকজনও রয়েছে। নাঃ, এখানে বসে থাকলে পেটে কিল ঠুকেই রাতে শুতে হবে, তার থেকে দেখাই যাক না ওখানে কি হচ্ছে। এই বলে সে তালগাছ থেকে লাফিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেই গ্রাম লক্ষ্য করে চলে।

বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সেই প্যান্ডেল বাঁধা জায়গাটায় পৌঁছায় মেছো। হ্যাঁ, কেমন একটা বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ি গন্ধ। বাড়িতে বেশ লোকজন। সে উঁকিঝুঁকি মেরে হেঁসেলের সন্ধান করতে থাকে। শুঁকতে শুঁকতে রান্নাঘরের সামনে এসে থমকে যায়, দেখে রান্নাঘরে খাবার সাজানো। আহ্লাদে মেছো ভাবে, আঃ, কি সুন্দর রান্না! বেগুনি, মাছের মাথা দিয়ে সোনা মুগের ডাল, কচুরি, মাংস,

আমার নাম ফটকে ওঝা।

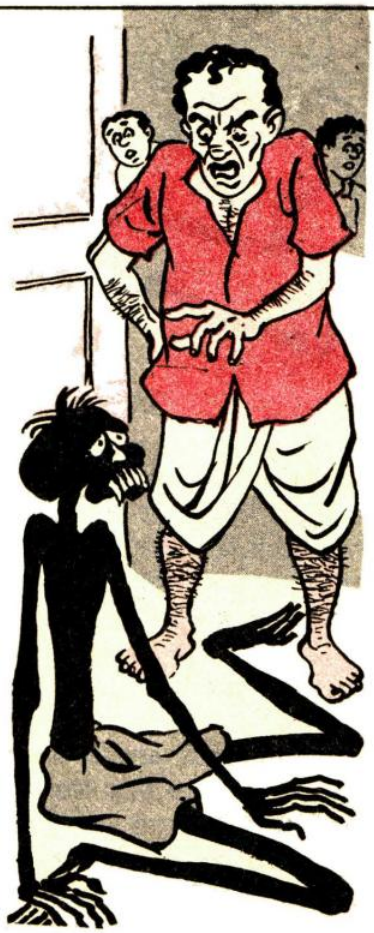

রসগোল্লা, দই, মিষ্টি। নাঃ, আজকে খাওয়াটা দারুণ হবে। খিদেও পেয়েছে ঢের। সেই সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে জীবন বেরিয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে ঢুকে পড়ে হেঁসেলের মধ্যে। ভেতরে ঢুকেই কিন্তু অঘটন ঘটে। ঘরের মেঝেতে খানিকটা তেল পড়েছিল, তার উপর পা পড়তেই পা পিছলে আলুর দম। দড়াম করে আওয়াজ। অমনি কে-কে বলে ছুটে এল বাড়ির মালিক। হেঁসেলের দরজা খুলে দেখে ভৈতরে কেউ নেই কিন্তু তেলে একটা পায়ের ছাপ। ততক্ষণে মেছো ঘরের আলসেতে লুকিয়েছে। কোমরে খুব লেগেছে। মনে মনে বলে, আঃ, আজকের দিনটাই অপয়া! সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে যাও একটা বিয়েবাড়ি পেলাম, খিদের জ্বালায় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা পিছলে পড়লাম। মনে হচ্ছে বাড়ির লোক সন্দেহ করেছে। ওঃ! মরে গেলাম গো। কোমরটা ব্যথায় একেবারে টনটন করছে গো। নাঃ, আর একটু বসি তারপর তাল বুঝে খেয়েদেয়ে সটকে পড়ব।

বাড়ির মালিক ছিল মস্ত বড় ওঝা। বহু গ্রাম-শহরে তার যাতায়াত ছিল। অনুষ্ঠান বাড়িতে যে বেশ কিছুদিন যাবৎ রান্না করা খাবার-দাবার চুরি হচ্ছে এ খবর সেও শুনেছিল। আজ তার ছেলের বৌভাত। সে জানত বিয়েবাড়ির গন্ধ পেয়ে বজ্জাত চোরটা ঠিক আসবে তাই সে তাকে ধরার জন্য ঘরের ভেতরে দরজার গোড়ায় বেশ খানিকটা আঠা আর তেল ফেলে রাখে। রান্নাঘরের পাশেই কান খাড়া করে ওত পেতে বসেছিল। আওয়াজ হতেই দৌড়ে আসে। কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকতেই সে ভূতের উপস্থিতি টের পায়। ব্যস, আর যায় কোথায়! ঘরে গিয়ে বলে, তোমরা সবাই উঠানে যাও, সামনেটা ফাঁকা রেখে দূরে গোল হয়ে দাঁড়াও।

কেন কেন? সবাই প্রশ্ন করে।

আজ তোমাদের ভূত দেখাব।

তাই নাকি তাই নাকি! কোথায় ভূত? সবাই চিৎকার করে।

আছে ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে, যাও যাও, তোমরা সবাই উঠানে যাও। দেখ কেমন করে ব্যাটাকে আমি জব্দ করি। ও ব্যাটা বহু অনুষ্ঠান বাড়ি ঢুকে খাবার চুরি করে খেত। আজ ওকে আমি খাব।

বাইরের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি মেছোর কানে আসে। সে তখন পালাবার জন্য আলসে থেকে নামতে যায়। কিন্তু নামতে গিয়ে আর নামতে পারে না। তাকিয়ে দেখে নিতম্বের হাড়ে এমনভাবে আঠা জড়িয়ে গেছে যে কিছুতেই সেই আঠা ছাড়ছে না। অনেক চেষ্টা করে শেষে লাফালাফি দাপাদাপি করতে থাকে। মনে পড়ে গেছোর কথা, চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন। মুখে মুড়ো ঝাঁটার বাড়ি পড়বে। নির্ঘাৎ ব্যাটা ভূত ধরার কল পেতেছে।

এমন সময় মালিক ওঝা এসে উপস্থিত। দরজা খুলে বিকট [illegible]

শুরু হয় ভূত ঝাড়া।

করে বলে, কিরে ব্যাটা চোরের ধাড়ি, খুব নেমন্তন্ন বাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছিস! কালিয়া কোপ্তা খেয়ে খেয়ে জিভ তোর খুব লম্বা হয়ে গেছে নারে! আজ মুড়ো ঝাঁটার বাড়ি মেরে তোর লোভ ছাড়াব। আমি ফটকে ওঝা, আমার নাম শুনলেই ভূতেরা পিঠটান দেয়, আর তুই কিনা আমার বাড়িতেই চুরি করে খেতে এসেছিস! দাঁড়া, তোর ঐ ভূতো মুখ ভোঁতা করে দেবো। যে কটা দাঁত আছে উপড়ে নেব তবে আমার নাম ফটকে ওঝা।

মেছো ভাবে তার চেহারা দেখে ভূতেরাই ভয় পায়, এ ব্যাটা পাচ্ছে না কেন? ওঝা না হাতি, এই বলে সেও ফটকেকে ভয় দেখাতে শুরু করে। মেছো যত ভয় দেখায় ওঝা তার কালো ছোপধরা দাঁত বার করে তত হাসতে থাকে। খানিক পরে মাকড়শার জালের মতো সুতো দিয়ে মেছোকে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধে। তারপর টানতে টানতে উঠানে এনে ফেলে। উঠানে তখন মস্ত ভিড়। সারা গ্রামের লোক জড় হয়েছে ওঝার বাড়ি। সবাই বলা-কওয়া করে, কি তাজ্জব ব্যাপার, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! মেছো ভূতের চেহারা দেখে বাচ্চা-বুড়ো সবার পিলে চমকে যায়। আরে ব্বাস কি বীভৎস চেহারা!

এবার শুরু হয় ভূত ঝাড়া। তার শত তাপ্পি দেওয়া ময়লা ঝোলার ভেতর থেকে কত রকমের সব জিনিস বার করে ফটকে ওঝা। তারপর বাড়ির সবচেয়ে পুরনো লোহার আঙোট পরানো মুড়ো খ্যাংরার ঝাঁটা আনে। শুরু হলো মার। ওঝা বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র বলে ঝোলার জিনিসগুলো ছুঁড়ে মারে আর ঝাঁটার দমাদম বাড়ি দেয় মেছোর পিঠে। কখনও ঝাঁটার গোড়া দিয়ে কখনও আগা দিয়ে চলতে থাকে পিটুনি। যন্ত্রণায় ডাক ছাড়ে মেছো, বাবারে, মরে গেলুম রে।

মার খেয়ে মেছো একেবারে আধমরা। এবার ওঝা ঘর থেকে নোড়া নিয়ে আসে। নোড়া দেখে মেছো ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। সেই বিকট চিৎকারে গ্রামবাসীরা ভয়ে দৌড় দেয়। মেছো কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওঝা, তুমি আমার বাপ, আর কোনোদিন চুরি করে খাব না। এই নাক মুলছি, কান মুলছি, আমায় ছেড়ে দাও।

ফটকে অবাক হবার ভান করে বলে, ছেড়ে দেব কিরে? দাঁড়া তোর ভূতো মুখ আগে ভোঁতা করি।

মেছো কেঁদে গড়াগড়ি দেয়, ও ওঝা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার দাঁত ভেঙো না, দাঁত ভাঙলে খাব কি করে?

ওঝা শোনে না, ভূতের বুকের উপর বসে চিৎকার করে বলে, উহুঁ ও কথা শুনবো না, তোকে প্রাণে মারব না কিন্তু দু'পাটি দাঁত ভেঙে দেব যাতে তুই আর কোনোদিন কোনো নেমন্তন্ন বাড়ি খেতে না পারিস। হা-হা-হা করে হাসতে থাকে ওঝা।

নোড়ার ঘায়ে মড়মড় করে দাঁতগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় তারপর শরীরের বাঁধন খুলে এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। বাতাসে ভাসতে ভাসতে সেই এঁদো চাতরার পুকুরের কাছে এসে মেছো ভাবতে থাকে, আমার চেহারার এই দশা দেখলে গেছো কি ভাববে কে জানে। কি করেই বা মুখ দেখাব বন্ধুকে। ভাবতে ভাবতেই গেছোর সঙ্গে দেখা।

এ কি রে, তুই মেছো তো? অবাক হয়ে গেছো বলে। এঃ! তোর এমন দশা কি করে হলো?

কি করে আর? তোর মুখ দেখে গিয়ে, বলে মেছো। সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাওয়া জোটেনি । জুটল বেদম ঠ্যাঙানি। ব্যাটা ফটকে ওঝা বেঁধে ঠেঙিয়েছে রে। শরীরের কলকব্জাগুলো ঢকঢক করে নড়ছে দ্যাখ।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তোর দাঁত কৈ?

আর দাঁত? হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে মেছো। শ্যাওড়া পাতা দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় গেছো। বলে, আহা কাঁদিসনি, কি আর করবি বল? যেমন কর্ম তেমনি ফল। কতবার বারণ করেছিলাম ওরে যাসনে, ওসব কালিয়া পোলাও আমাদের জন্য নয়, এখন দেখলি তো! কাল থেকে আমার সঙ্গে এঁটোকাঁটাই খাস।

তা তো খাবই, ফোঁপায় মেছো, আবার যাই! ওফ, এখন কতদিন কলমির দামে না খেয়ে পড়ে থাকতে হবে কে জানে! যা গেছো শুয়ে পড়, আমিও যাই।

ছবিঃ দিলীপ দাস

মধুরেণ সমাপয়েৎ

অমিতাভশঙ্কর রায়চৌধুরী

কলকাতা যদি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, তাহলে রসগোল্লার রাজধানী হলো কালনা। স্টেশনের নাম অম্বিকে কালনা। কিন্তু লোকমুখে কালনা এবং মুখে মুখে মিষ্টি। রসগোল্লা, রাজভোগ, সন্দেশ, ছানার মুড়কি, কাঁচাগোল্লা, ছানাপোড়া... ইস।

আমাদের কাশীনাথদা'র শ্বশুরবাড়ি সেই কালনায়। কাশীদা সেবার জামাইষষ্ঠীর দিন পাঁচেক আগে বৌদি-বাচ্চাদের নিয়ে কালনা রওনা দিলেন। ষষ্ঠী পুজোর পেট পুজো সেরে কাশীদা কাশীতে ফিরবেন। আর সকলে গরমের ছুটিটা মামাবাড়িতেই কাটাবে। ষষ্ঠীর দিন দুই বাদে—

সবে কাক-ডাকা ভোর। কাশীদা অম্বিকে কালনার প্ল্যাটফর্মে আবির্ভূত হলেন। এক হাতে স্যুটকেস আর অন্য হাতে? আহা! একটি নাইলনের থলিতে পরপর তিনটে হাঁড়ি ভর্তি রাজভোগ, ছানার মুড়কি আর কাঁচাগোল্লা। বোঝাই যাচ্ছে মাসিমা (কাশীদার শাশুড়ি) জামাই বিদেয়টা দরাজ হাতে করেছেন।

কালনা থেকে প্রথমে সোজা ট্রেনে যাবেন হাওড়া। সেখান থেকে পূর্বা এক্সপ্রেসে বেনারস।

একটু পরেই গলা খাঁকারি দিতে দিতে ট্রেন হাজির! কিন্তু হায় বাবা বিশ্বনাথ! কাশীদা ট্রেনে সমাসীন হন কি করে? এদিকে আধ মিনিটও স্টপেজ নয়। মৌচাকে ভনভন করা মাছির মতো প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে প্যাসেঞ্জাররা গমগম করছে। কাশীদা বেচারী কাশীর ছেলে। সাইকেল রিকশা ছাড়া বাসেই চাপেননি বড় একটা। তিনি ঘামতে আরম্ভ করেছেন। আজকে অবিশ্যিই ট্রেন ছেড়ে যাবে। বাড়ি ফিরবেন কি করে?

বিয়ের দশ বছর বাদে আজ হঠাৎ কাশীদার নিজের পিতৃদেবের ওপরেই কিঞ্চিৎ ক্রোধ হয়ে গেল। 'আর কোথাও সম্বন্ধ জোটাতে পারলে না? এমন অজ পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি! অন্ধকার থাকতেই তো শ্বশুর বিদেয় করে দিলেন, তাড়াতাড়ি যাও নইলে ট্রেন মিস করবে। এদিকে আমিই যে ফিনিশ হয়ে যাচ্ছি। উঃ!'

একটা জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন কাশীদা। নাহ্ তিলধারণের জায়গা নেই। চল্লিশের কোঠায় পা দিয়ে আজ হঠাৎ কাশীদার ভ্যাঁ করে কান্না পেয়ে গেল।

'কি দাদা, রাইট ফ্রম ফাদার-ইন-ল'স হাউস?' হাতের থলিটাকে লক্ষ্য করে একজনের প্রশ্নবাণ।

এমন প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতেও স্মিতহাস্য করতে হলো।

'শাশুড়ি ঠাকরুণ দেখছি একেবারে সাক্ষাৎ মা ষষ্ঠী। একসঙ্গে তিন হাঁড়ি। সাক্ষাৎ ত্রিদেব।' আরেকজন ছুঁড়ল হাসির ছুঁচোবাজি।

তাদের মধ্যমণি করে বসিয়ে দিল।

'আরে চলে আসুন, চলে আসুন', বলতে বলতে তাদেরই একটি ছেলে স্যুটকেসটা হাত থেকে টেনে নিল।

ট্রেন ততক্ষণে স্টার্ট দিয়েছে। 'জয় বজরঙ্গবলী।' বলে কাশীদাও গন্ধমাদন হাতে হ্যান্ডেল ধরে উঠে এলেন।

ধড়ে প্রাণ এলো।

উন্মুক্ত প্রান্তরের বুক চিরে সর্পিল পথ বেয়ে ট্রেন ছুটছে। আর ভিড় ঠেলে ঠেলে সাপের মতোই এঁকেবেঁকে সক্কলের গা বাঁচিয়ে পিছলে চলেছেন—হাঁড়ি হস্তে স্যুটকেসসহ কাশীদা। যতটা সেঁধুনো যায়।

ছেলেগুলোর মুখ যতই চোখা হোক না! কেন তারাই কাশীদাকে 'হাত ধরে' এগিয়ে নিয়ে চলল এবং বলতে গেলে তাদের মধ্যমণি করে বসিয়ে দিল।

'আরে দিন দিন, স্যুটকেসটা ওপরে তুলে দিই। আপনি আরাম করে বসে থাকুন। আপটু হাওড়া! তখন তো সবই চিচিং ফাঁক।' তাদেরই একজন তাকে আপ্যায়িত করল।

দেখতে দেখতে অবিশ্যি স্যুটকেসের সঙ্গে হাঁড়ির বোঝাটাও দোদুল্যমান হয়ে উত্তোলিত হলো। কাশীদার মনে কি একটা শঙ্কার মেঘ ঘনাল। কিন্তু বাধা দেন কি করে? একবার ঢোঁক গিলে চুপ করে গেলেন।

'তারপর, কোথায় যাবেন দাদা?'

'বেনারস।'

'সেখানেই বাস? এখানে শ্বশুরবাড়ি বুঝি?'

কাশীদার স্মিত হাস্য।

'বাহ্! তাই না বলি, এই এত—'

'আমারও ইচ্ছে আছে একবার নর্থ ইন্ডিয়াটা ঘুরে আসবো—'

এই ভাবেই কথা এগিয়ে চলল। এবং ট্রেনও।

গাড়ির দুলুনিতে কাশীদার একটু তন্দ্রা মতন এসে গেল। একবার উঠে স্যুটকেসটা দেখার চেষ্টা করতেই বাঙ্কের ওপর থেকে দুটো ছেলে হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আরে দাদা, আপনার জিনিস সমস্ত ঠিক আছে। একেবারে হাওড়া গিয়ে হ্যান্ড ওভার করে দেব।'

স্যুটকেসের কোনাটাও দেখা গেল। ফলে একরকম নিশ্চিন্দি হয়েই কাশীদা বসে পড়লেন এবং 'আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে'...ঘুমের পরীর আর দোষ কি? সেই রাত থাকতে উঠতে হয়েছে।

'আরে উঠুন উঠুন। বেশ এক ঘুম দিয়ে নিলেন যা হোক।'

কাশীদা চমকে চোখ মেলতেই দেখেন গাড়ির লোকেরা নামতে আরম্ভ করেছে। সেই ছেলেগুলো তাঁকে ঠেলা দিচ্ছে।

'হাওড়া এসে গেছে। এবার গাড়ি আবার ব্যাক করবে।'

একজন যাবার সময় স্যুটকেসটা নামিয়ে দিয়ে গেল।

কাশীদা অস্ফুটস্বরে বলেন, 'থ্যাংক ইউ।'

'আরে কি যে বলেন—' বলতে বলতে চারজনেই নেমে গেল। জানলায় চকিতে তাদের মুখগুলো আবার ভেসে উঠল, 'ধন্যবাদ তো আমাদেরই আপনাকে দেওয়া উচিত।'

'মানে?'

'আপনার সঙ্গে আমাদের সময়টা এত মি—ষ্টি—কাটল।'

কাশীদা কথাটার অর্থ খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন হঠাৎ কবিত্ব কেন রে বাবা? যাক, নামতে হবে। উঠে দাঁড়ালেন। নাইলনের থলেতে বাঁধা হাঁড়ি তিনটে বাঙ্ক থেকে নামালেন।

কিন্তু এ কি! হাঁড়ি এত হাল্কা কেন?

তাড়াতাড়ি কাশীদা হাঁড়ির মুখটা দেখেন—প্রত্যেকটি হাঁড়ির মুখের পাতা যত্ন করে সরানো আর...

টি.ভি. সিরিয়ালের দৈববাণীর মতো তাঁর কানে বেজে উঠল—'আপনার সঙ্গে সময়টা এত মি—ষ্টি কাটল।'

গাড়িটা কি দুলে উঠল? নাকি কাশীদার মাথাটাই ঘুরে উঠল?

ছবি : জুরান নাথ

মধু-কৈটভ বধ

শান্তিগোপাল পাণ্ডে

সে অনেকদিন আগের কথা। তখনও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি। একদিন ভগবান বিষ্ণুর কী খেয়াল হলো কে জানে! তিনি তাঁর কান থেকে একটু ময়লা বের করে অযথা আঙুল দিয়ে ঘষতে শুরু করলেন। ঘষতে-ঘষতে সেই ময়লা এক সময় দু'খান হয়ে গেল। তখন তিনি নিতান্তই অবহেলার সঙ্গে তা ফেলে দিলেন।

ময়লা ফেলে দেওয়া মাত্রই ঘটলো এক আশ্চর্য-অভাবনীয় কাণ্ড। সেই ময়লা থেকে জন্ম নিল দুটি ভয়ঙ্কর দৈত্য। মধু আর কৈটভ। মহাবলবান তারা। ব্রহ্মা ছিলেন বিষ্ণুর নাভিপদ্মে। জন্ম মাত্রই দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে দেখতে পেল। অমনি তারা তেড়ে গেল তাঁকে মারার জন্যে।

মধু-কৈটভকে তেড়ে আসতে দেখে ব্রহ্মা ভয় পেলেন। কাঁপতে লাগলেন প্রচণ্ড। ভয় নিবারণের জন্যে তিনি বিষ্ণু স্তুতি করতে-করতে কাতরভাবে বললেন,

একি একি প্রভু আজ
করলো বিপদ,
এবার আমায় দৈত্য
করবে যে বধ!
বাঁচাও, বাঁচাও প্রভু
হতে দুইজন,
নইলে তোমার সৃষ্টি
রইবে কেমন?

ব্রহ্মার এই কাতর প্রার্থনা শুনে বিষ্ণু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন,

অবধান করো ব্রহ্মা
দূর করো ভয়,
করবো এখুনি আমি
বধ দৈত্যদ্বয়!

বিষ্ণুর আশ্বাসবাণী শুনে ব্রহ্মা ক্ষণিকের জন্যে ভয়মুক্ত হলেন।

বিষ্ণু মধু-কৈটভের উদ্দেশে রণ-আহ্বান জানালেন। বললেন,

আয় মধু-কৈটভ
কর তবে রণ,
পাঠাবো তোদের আমি
শমন ভবন!

বিষ্ণুর রণ-হুঙ্কার শুনে মধু-কৈটভও এলো তেড়ে। শুরু হলো ভয়ানক যুদ্ধ! সেই যুদ্ধ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চললো মহাশূন্যে। কিন্তু শেষ অবধি বিষ্ণুরই পরাজয় হলো। তিনি ভাবলেন, তাঁর শরীরে বুঝি শক্তি নেই তাই তাঁর এই পরাজয়! তখন তিনি শক্তিকে আহ্বান করতে লাগলেন।

শক্তি...শক্তি...বলে চিৎকার করতে-করতে ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করলেন। কপালে তাঁর মুক্তোর মতন ফুটে উঠলো স্বেদবিন্দু। তারপর সেই বিন্দু একটু-একটু করে বড় হতে-হতে এক সময় পড়ে গেল নিচে। বিন্দু থেকে জন্ম নিলেন শক্তি—আদ্যাশক্তি মহামায়া! তিনি এসে দাঁড়ালেন বিষ্ণুর সম্মুখে। প্রণাম করে বললেন,

প্রণাম জানাই প্রভু
দেব সনাতন,
আদেশ করুন দেব
কি বা প্রয়োজন?

শক্তিকে সামনে দেখে ক্লান্ত বিষ্ণুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন,

মধু-কৈটভ সাথে
পাঁচটি বছর,
হলো মহারণ সে যে

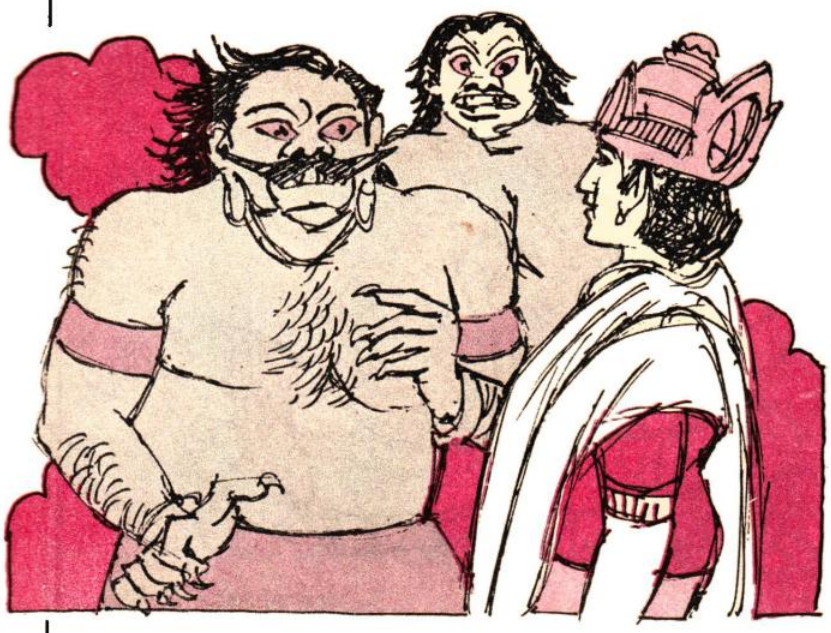

তাই হবে তাই হবে/ দিলাম এ বর

অতি ভয়ঙ্কর!
তবুও আমার জেনো
হলো পরাজয়,
তাই ওই দৈত্য হতে
মনে লাগে ভয়।
অতি বড় পাজী ওই
দৈত্য দুইজন,
পথ করো যাতে হয়
তাদের মরণ।

শক্তি বললেন,

যে আজ্ঞা আমায় প্রভু
করলেন দান,
সমাধান করে কাজ
রাখি তার মান।

দেবী আদ্যাশক্তি বিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে মধু-কৈটভের জিহ্বার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তাতে তাদের বুদ্ধি লোপ পেল। মুখের ভাষা বদলে গেল! বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে তারা বিষ্ণুকে এসে বললো,

হারলি যে বিষ্ণুবেটা
হলি শক্তিক্ষয়,
দেখ রে এবার করি
ধ্বংস উপচয়!
কিন্তু তার আগে তোকে
দেবো এক বর,
মনোমতো নে রে তুই
দেবো সত্বর।

দৈত্যদের কথায় বিষ্ণু খুশি হয়ে বললেন,

যদি বর দিবি দৈত্য
দে রে বর এই—
মরিস দু'ভাই যেন
আমার হাতেই!

এই কথা শুনে দৈত্যরা একটু চমকে উঠলো। ভাবতে লাগলো বিষ্ণুকে তারা বর দেবে কিনা। কিন্তু তাদের বুদ্ধি লোপ পাওয়াতে অত-শত না ভেবেই তারা বললো,

তাই হবে তাই হবে
দিলাম এ বর,
একথা মনেতে তুই
রাখ চিরতর।
তবে বুঝ জল-স্থল
আর অস্ত্রাঘাতে,
মোদের মরণ কভু
হবে নাকো তাতে!

মধু-কৈটভ যেই একথা বলেছে, অমনি বিষ্ণুর মুখে হাসি দেখা দিল। দেখতে-দেখতে বিষ্ণু বাড়তে শুরু করলেন। বাড়তে-বাড়তে তিনি ধারণ করলেন বিরাট রূপ। হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,

আয় মধু-কৈটভ
তবে একবার,
এখুনি তোদের নাশ
করি দুরাচার!

বিষ্ণুর রণ-আহ্বান শুনে মধু-কৈটভও এলো সংগ্রাম করতে। কিন্তু তারা আর বিষ্ণুর নাগাল পাবে কেন? বিষ্ণুর শরীর বাড়তে-বাড়তে, তাঁর মাথা তখন আকাশ ছুঁই-ছুঁই। তবুও তাঁর শরীর বাড়ার অন্ত নেই। দৈত্যরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো তাঁর প্রলম্বিত শরীরের দিকে।

তারপর বিষ্ণু তাঁর দুটি হাত নিচের দিকে করে মধু-কৈটভের চুলের মুঠি ধরলেন। তুললেন মহাশূন্যে। মধু-কৈটভ ভয়ে চিৎকার করতে-করতে বলতে লাগলো,

একি, একি বিষ্ণুদেব
বাধো এই ফের!
রক্ষা করো রক্ষা করো
ছাড়ো আমাদের।

বিষ্ণু তাঁদের ছাড়লেন না। কে-ই বা এই মহাপাপীদের সৃষ্টি ধ্বংস করার জন্যে ছেড়ে দেবে? তাই বিষ্ণু তাদের আরও ওপরে তুলতে লাগলেন। তারপর তাদের কথা মতন জলে, স্থলে না-মেরে, কোনোরকম অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার না-করে, তাদের পেটের মধ্যে তাঁর নিজের সুদীর্ঘ নখগুলো ঢুকিয়ে দিলেন। ব্যস! আর যায় কোথা! দৈত্যরা কাতর চিৎকার করতে-করতে মৃত্যুবরণ করলো।

এরপর তাদের বিশাল দেহ দুটি বিষ্ণু কারণবারির* মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। ভাসতে লাগলো দেহ দুটি কারণবারির মধ্যে। তাদের দেহের মাংস থেকে উৎপত্তি হলো মাটির। আর তাদের চর্বি বা মেদে পৃথিবীর সৃষ্টি বলে, পৃথিবীর আরেক নাম 'মেদিনী'।

ব্রহ্মাও এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি বিষ্ণুর লীলাগুণে মুগ্ধ হয়ে বারংবার তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করতে লাগলেন।

(সূত্রঃ বৃহৎ কৃষ্ণলীলা সারাবলী)

* ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে ভগবান জলের সৃষ্টি করেন। ঐ জলই 'কারণবারি' নামে পরিচিত।

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

কোনও গল্প নেই,
নিখুঁত তথ্যসমৃদ্ধ রচনা
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

‘বইব্যবসা ও পাঁচপুরুষের বাঙালী পরিবার’

১৮৬০ সালে বরদাপ্রসাদ মজুমদার পাতিহাল থেকে কোলকাতা এলেন। জমিদারি ছেড়ে শুরু করলেন বইফেরি। তাঁর শুরু করা সেই ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন শতাব্দীতে পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল। কিভাবে, কতটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, দেশে-বিদেশে দুর্লভ এরকম একটি প্রতিষ্ঠান দেড়শ বছরের দিকে এগিয়ে চলেছে? নির্ভীক, নির্মোহ লেখনীতে অবিচ্ছিন্ন সেই ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ দলিল।

(বৈশাখ সংখ্যা থেকে নবকল্লোলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে)

Registration No. Tech/W.B./RNP-93/ 2001 July "Suktara"

বাহাদুর বেড়াল